আমার বন্ধু
সুবোধ দাশগুপ্ত

আমার বন্ধু মংশু

(কিশোর উপন্যাস)

সুবোধ দাশগুপ্ত

নয়া প্রকাশ
২০৬ বিধান সরণি
কলিকাতা ছয়

AMAR BANDHU MANGSU *by* SUBODH DASGUPTA
ISBN 81-85109-74-5

প্রকাশনে

নয়া প্রকাশ

২০৬ বিধান সরণি, কলিকাতা-ছয়

প্রথম প্রকাশ ঃ আশ্বিন ১৩৯৪

ভিতরের ছবি ঃ কুমারেশ দাস

প্রচ্ছদ ঃ মনোজ চক্রবর্তী

ব্লক ঃ প্রসেস এণ্ড অ্যালায়েড গ্রাফিক্স,
কলিকাতা-বারো

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ দরবারী উদ্যোগ

মুদ্রণে

দরবারী উদ্যোগ

গঙ্গানগর

উত্তর ২৪ পরগণা

দাম ঃ দশ টাকা

আমার বন্ধু মংশু

আমরা বন্ধু হলাম

হরিদাসপুর একটি গ্রামের নাম। পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণার একটি ছোট গ্রাম। তবে গ্রামটা নেহাৎ ছোট নয়, আবার খুব যে বড় তাও নয়। মোটামুটি গ্রামগুলো যেরকম হয়ে থাকে হরিদাসপুরও সেই রকমই একটি গ্রাম।

এই গ্রামে চারজন দুষ্টু ছেলে থাকতো। আরো অনেক দুষ্টু ছেলে নিশ্চয়ই থাকতো তবে আমি তাদের কথা বলছি না। আমি শুধু চারজন দুষ্টু ছেলের কথা বলছি।

এই চারজনের ভেতর আমিও একজন। তাই এই চারজন দুষ্টু ছেলেদের নিয়ে যে কাহিনী আমি বলছি তা আগাগোড়া খাঁটি সত্যি, একটুও ভেজাল নেই। কিন্তু তার আগে তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে আমি সত্যি সত্যি একজন দুষ্টু ছেলে।

প্রথম প্রথম আমার নিজেরই বিশ্বাস হত না যে আমি একজন দুষ্টু ছেলে। তবে আমার বাবা আমাকে সব সময়েই বলতেন দুষ্টু ছেলে। মাও বলতেন দুষ্টুটা। আর আমার মেজকাকা একদিন সত্যি সত্যি একজোড়া নটি বয় জুতো কিনে দিলেন। নটি বয় কথাটার মানে তোমরা জান তো! এই জন্যই আমার মনে বিশ্বাস জন্মে গেছে যে আমিও তাহলে সত্যি সত্যি একজন দুষ্টু ছেলে।

তোমাদের বিশ্বাস হল না? আরো প্রমাণ চাও? তাহলে শোন। একদিন আমি মাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেছিলাম—মা, তোমরা আমাকে দুষ্টু ছেলে বল কেন? আমার প্রশ্ন শুনে মা কি করলেন জান! বলতে আমার একটু একটু লজ্জা করছে। তোমরা কাউকে বলে দিও না যেন।

আমার প্রশ্ন শুনে মা আমাকে কোলে তুলে নিলেন আর এমন আদর করতে লাগলেন যে আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। তারপর কানে কানে বললেন—দুষ্টু ছেলেদের আমার খুব ভাল লাগে।

এখন বুঝলে তো আমি সত্যি সত্যি একজন দুষ্টু ছেলে। অন্য তিনজন দুষ্টু ছেলের কথা পরে আসবে। কারণ তখনো আমরা কেউ কাউকে জানতে পারিনি।

আমি যখন একটু বড় হয়েছি, অর্থাৎ যখন অ আ ক খ এবং এ বি সি ডি পড়তে শিখেছি এবং এক দুই গুনতে শিখেছি তখন আমাকে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করানো হল। গ্রামের স্কুল হলে কি হবে স্কুলটা ছিল বেশ বড় এবং নামকরা। এই অঞ্চলে এরকম স্কুল আর ছিল না। তাই অনেক দূর দূর গ্রাম থেকেও বহু ছেলে এই স্কুলে পড়তে আসতো।

স্কুলের প্রথম বছর অর্থাৎ ক্লাশ ওয়ানে উল্লেখ করবার মত কোন ঘটনা ঘটেনি। তবে মাঝে মাঝে দু-একটা হাঁদামার্কা ছেলের সঙ্গে মারামারি হত। আমি তো রোজ স্যাণ্ডো করি, ওরা কেউ আমার সঙ্গে পারত না।

স্কুলের দ্বিতীয় বছর অর্থাৎ ক্লাশ টুতেও তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি। তবে মাঝে মাঝে মারামারি হত এবং মাস্টার মশায়ের

বেতও মাঝে মাঝে খেতে হত। তবে আমি সেসব গ্রাহ্য করতাম না। আর আমার জিনের হাফপ্যাণ্ট এত মজবুত ছিল যে মাস্টার মশায়ের বেত কোন ক্ষতি করতে পারত না।

তবে ক্লাশ থ্রি বছরটা ছিল খুব ইমপরট্যাণ্ট। একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই বছর ঘটে।

আমি তো রোজ স্যাণ্ডো করি, ওরা কেউ আমার সঙ্গে পারত না।

সেদিন ছিল সোমবার। হ্যাঁ, আমার পরিষ্কার মনে আছে, কারণ তার আগের দিন ছিল রবিবার। আমি ক্লাশে বসে আছি। তখনো ক্লাশ আরম্ভ হয়নি, সব ছেলেরাও তখনো আসেনি। আমার পকেটে ছিল দশ পয়সা। আমি বসে বসে ভাবছিলাম

চিনাবাদাম ও ছোলাভাজা না আলুকাবলি ও ফুচকা, কোনটা ভাল হবে। একটা ছেলে ক্লাশে ঢুকে বলে উঠল, ক্লাশ ওয়ানে একটা নতুন চেয়ার দেখে এলাম।

আর একটা ছেলে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আমিও দেখেছি।

নীল কোটপরা একটা ছেলে বেশ জোরগলায় বলে উঠল, ক্লাশ থ্রি হল একটা খুব ইমপরট্যাণ্ট ক্লাশ। ক্লাশ ওয়ানের ছেলেদের একটা নতুন চেয়ার পাবার কোন অধিকার নেই।

আর একটা ছেলে বললে, কিন্তু এ নিয়ে আমরা কি করব, বা করতে পারি।

তখন দু-তিনজন ছেলে একসঙ্গে বলে উঠল, চলো আমরা হেডমাস্টারের কাছে যাই এবং আমাদের ক্লাশের জন্য একটা নতুন চেয়ার দিতে বলি।

হেডমাস্টারের কাছে যেতে হবে এই প্রস্তাবে সকলেই বেশ দমে গেল। একজন তাই বললে, হেডস্যারের কাছে গিয়ে কোন লাভ হবে না। তিনি বলবেন আচ্ছা দেখা যাবে, তারপরেই সব ভুলে যাবেন।

নীল কোট ছেলেটা বললে, তুমি ঠিকই বলেছ। হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে কোন লাভ হবে না। যা কিছু করবার আমাদেরই করতে হবে। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আমাদের একটা ডিরেক্ট অ্যাকশন নেওয়া দরকার হবে।

ছেলেটার কথা শুনে সবাই হৈ-হৈ করে উঠল।

ক্লাশের ঘণ্টা পড়ে গেল, আলোচনাও বন্ধ হল। টিফিন পিরিয়ডে আবার আলোচনা শুরু হল।

আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল আগামীকাল আমরা সকলেই এক-ঘণ্টা আগে স্কুলে আসব, আমাদের পুরানো নড়বড়ে চেয়ারটা ক্লাশ ওয়ানে রেখে ওদের নতুন চেয়ারটা আমাদের ক্লাশে নিয়ে আসব।

মহা-উৎসাহে সকলেই রাজী হয়ে গেল।

একটা চেয়ার নিয়ে এত উত্তেজনার কারণ আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। চেয়ার তো মাস্টারমশায়দের জন্য। তবু পরের দিন আমি একটু সকাল সকাল স্কুলে গেলাম। ভেবেছিলাম অনেক ছেলে এসে যাবে। কিন্তু স্কুলে পৌঁছে দেখি তিনটি ছেলে চুপচাপ বসে আছে। আমাকে নিয়ে আমরা চারজন হলাম।

আরো কেউ আসবে কিনা দেখবার জন্য আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। একজন বললে, সময় চলে যাচ্ছে, আর দেরী করা ঠিক হবে না। ক্লাশ ওয়ানের ছেলেরা এসে যাবে।

আমি বললাম, আমরা চারজনই যথেষ্ট।

নীল কোট বললে, তাহলে এস, হাত লাগাই।

আমরা চারজন আমাদের ক্লাশের পুরানো চেয়ারটা কাঁধে করে নিয়ে ক্লাশ ওয়ানে রেখে এলাম এবং ওদের নতুন চেয়ারটা আমাদের ঘরে নিয়ে এলাম। চেয়ার দুটো খুব ভারী ছিল না তবু আমাদের বেশ হাঁপিয়ে উঠতে হয়েছিল।

কাজ শেষ হলে আমরা খুশি মনে পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করতে বসলাম এবং আলাপ করতে শুরু করলাম।

নীল কোটই প্রথমে আরম্ভ করল। বললে আমরা তো কেউ কাউকে ঠিক মত জানি না কিন্তু আজ থেকে আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম। এস আমরা আলাপ করি এবং নিজ নিজ পরিচয় দি।

এই বলে সে নিজেই আরম্ভ করল, আমার নাম হিমাংশু চৌধুরী। সকলে আমাকে মংশু বলে ডাকে। তোমরাও আমাকে মংশু বলে ডাকতে পার।
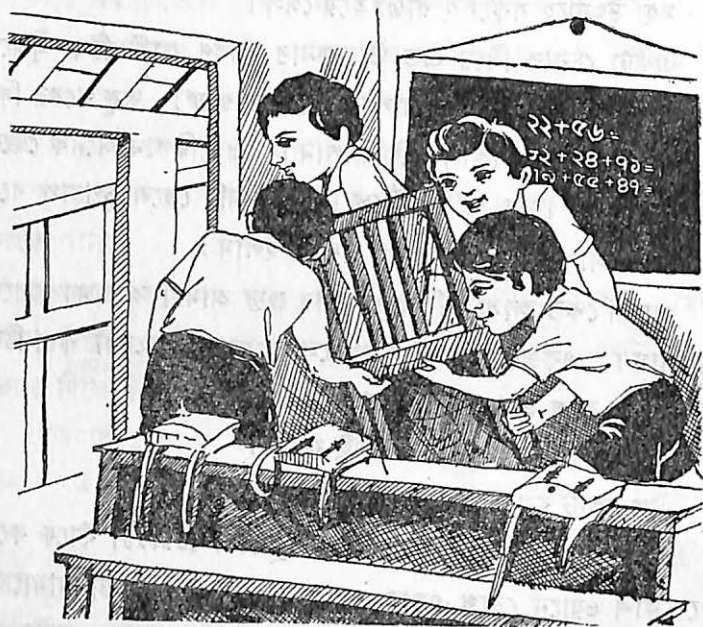
আমরা চারজনে ওদের নতুন চেয়ারটা নিয়ে এলাম

আর একজন বললে, আমার নাম দেবেন্দ্রনাথ দত্ত। তোমরা আমাকে দেবু বলে ডাকতে পার।

তৃতীয় ছেলেটি বললে, আমার নাম শিবনারায়ণ সাহা। সবাই আমাকে শিবু বলে ডাকে। তোমরাও আমাকে শিবু বলতে পার। আমার কোন আপত্তি নেই।

সবশেষে আমি বললাম, আমার নাম বুদ্ধদেব বসাক। সবাই আমাকে বুদ্ধু বলে ডাকে। তোমরাও আমাকে বুদ্ধু বলতে পার।

আমার কথা শুনে হিমাংশু বললে, বুদ্ধ নামটা ভাল নয়। তোমাকে আমরা বিবি (**B. B.**) বলে ডাকব।

মংশুর কথা শুনে সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। আমি একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম।

এইভাবে আমরা চারজন দুষ্টু ছেলে চারজন ভাল বন্ধু হয়ে গেলাম।

রায়বাবুদের পেয়ারা বাগান

আমরা চার বন্ধু। ক্রমে বন্ধুদের সম্বন্ধে আরো অনেক খবর জানা গেল।

মংশু মানে হিমাংশু চৌধুরী, এক মস্ত জমিদারের একমাত্র ছেলে। জমিদারী তো আজকাল আর নেই তবু ওদের অনেক জমি-জমা ও পাকা বাড়ী আছে। মংশুর মা নেই, বাবাও নেই। এক বিধবা পিসি আছেন, তিনিই মংশুকে পালন করেন। পিসিরও কোন ছেলেপুলে নেই। মংশুর পিসিও এক সময় বেশ বড় জমিদার ছিলেন। তাঁরও অনেক সম্পত্তি, পাকা বাড়ী আছে। সুতরাং তাদের অবস্থা খুব ভাল। তবে মংশু নিজে তো পিতৃমাতৃহীন অনাথ। ওকে দেখলে কিন্তু সেরকম মনে হয় না।

দেবুর বাবার একটা বইয়ের দোকান আছে। আমাদের স্কুলের কাছেই সেই দোকানটা। দোকানে বই-খাতা ছাড়াও লজেন্স, চকলেট, টফি এবং আরো অনেক কিছু পাওয়া যায়। আমি এই দোকানে অনেকবার গিয়েছি। তখনো দেবুর সাথে আলাপ হয়নি। এখন ঐ দোকানে যেতে বেশ একটু সংকোচ বোধ করি।

শিবুর বাবা একজন ডাক্তার। আমাদের গ্রামের বাজারের এক-পাশে তাঁর ডিসপেন্সারী আছে। আমাদের গ্রামের বাজারটা বেশ বড়। অনেক দোকানঘর আছে। পাশের গ্রামের লোকেরাও এখানে বাজার করতে আসে। আর সাপ্তাহিক হাটের দিনে তো কথাই নেই। তখন দূর দূর গ্রাম থেকে বহুলোক তাদের মালপত্তর নিয়ে আসে বেচা-কেনা করবার জন্য। এই বাজারটার জন্যই আমাদের গ্রামের নাম অনেকের কাছে সুপরিচিত।

ক্লাশে বসবার জন্য আমাদের কোন নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। তবে একই জায়গায় বসতে বসতে প্রায় সকলেরই জায়গা নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল, বিশেষতঃ প্রথম সারির বেঞ্চগুলিতে। এই নিয়ে মাঝে মাঝে বেশ ঝগড়াও হত। যা হোক আমরা বন্ধু হবার পর আমরা চারজন পাশাপাশি বসবার ব্যবস্থা করে নিতে পারলাম। পিছনের বেঞ্চে বসাটাই আমরা বেশ নিরাপদ মনে করলাম। কিন্তু তবুও মাস্টারমশায়দের নজর সব সময় এড়াতে পারতাম না।

স্কুলের ছুটির পর আমরা আর তখনি বাড়ী চলে যেতাম না। চার বন্ধু কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় টো টো করে বেড়াতাম। কখনো কখনো গ্রাম ছাড়িয়েও চলে যেতাম। 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির

গুলতি দিয়ে কাঠবেড়ালী তাড়া করতেও বেশ মজা লাগত

পথ' গানটা গাইতাম বটে তবে আমাদের গ্রামে এবং গ্রামের বাইরে কোথাও রাঙা মাটির চিহ্নও ছিল না।

পুকুরে ঢিল ছোঁড়া আমাদের একটা খেলা ছিল। ঢিলটা পুকুরের মাঝখানে পড়লে গোল গোল করে ঢেউ উঠত, দেখতে ভারী মজা লাগত। আবার কায়দা করে ঢিল ছুঁড়তে পারলে ঢিলটা ব্যাঙাচির মত লাফাতে লাফাতে চলে যেত। সেও এক বাহাদুরী। আর গুলতি দিয়ে কাঠবিড়ালী তাড়া করার ভেতরও আমরা বেশ মজা পেতাম।

আমাদের গ্রামে রায়বাবুদের একটা পেয়ারা বাগান ছিল। ছিল মানে এখনো আছে। এই বাগানটার ওপর আমাদের একটা

নজর ছিল তবে কোনদিন ঢুকতে সাহস হত না। রায়বাবু নিজে লোক খুব সুবিধার ছিলেন না। তাছাড়া ছোট ছেলেদের তিনি একদম দেখতে পারতেন না। তবু মাঝে মাঝে নানারকম সুযোগ এসে যেত।

একদিন রায়বাবু নিজে আমাদের স্কুলে এলেন। হেডমাস্টারের কাছে আমাদের নামে নালিশ করলেন। তার আগে আসল ঘটনাটা কি হয়েছিল বলে রাখি।

সেদিন আকাশটা খুব মেঘলা ছিল। ঘন কালো মেঘ, মাঝে মাঝে গর্জন ও বিদ্যুতের চমক। ঝড়ো হাওয়া বইছিল। আমরা চার বন্ধু বাজার থেকে ফিরছিলাম। আকাশের এই ঘনঘটা আমাদের বেশ ভাল লাগছিল। তাই আমরা সোজা পথে না গিয়ে একটু ঘুরে রায়বাবুদের বাগানের পাশ দিয়ে যাবার রাস্তাটা ধরেছিলাম। কিন্তু বাগানের কাছে আসতে না আসতেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। আমরা দৌড় লাগালাম। বাঁশের বেড়া ভেঙ্গে ডিঙ্গিয়ে বাগানে ঢুকে পড়লাম এবং মালির একচালাটার নীচে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। বৃষ্টির আগেই মালি সেখান থেকে পালিয়েছে সুতরাং বাধা দেবার কেউ ছিল না। আর থাকলেও ওই অবস্থায় কেউ নিশ্চয় বাধা দিত না।

আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, একটু একটু ভিজছি আর চারদিকে নজর দিচ্ছি। দেখলাম ছোট বড় কয়েকটা পেয়ারা মাটিতে কাদায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। আমরা ত্রু-একটা তুলে নিলাম, খেয়ে দেখলাম খুব বিশ্রী। আমরা তখন গাছের ওপরের দিকে চাইলাম। দেখলাম গাছের উঁচু উঁচু ডালে বড় বড় পাকা পেয়ারা ঝুলছে।

আমরা হাত তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে ধরবার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। দেবু বললে, নাগালের বাইরে তাই শেয়াল মনের দুঃখে বলেছিল দ্রাক্ষাফল নিশ্চয়ই টক। শিবু বললে, আমরা তাহলে শেয়াল হয়ে গেলাম নাকি !

তোমরা বোধহয় বুঝতে পারছো আমরা বেশ ভাল ছেলে, মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করি এবং বইতে যা পড়ি তা সহজে ভুলি না।

দেবু ও শিবুর কথা শুনে মংশু বললে, কাক ও জলের কলসীর একটা গল্পও আমরা পড়েছিলাম।

আমরা একসঙ্গে বলে উঠলাম, তাই তো ! ইচ্ছা থাকলেই তো উপায় হয়।

তারপরে যে কাণ্ডটা ঘটল তা তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করে নিতে পারছো। গাছপাকা বড় বড় পেয়ারা সত্যি বেশ উপাদেয় জিনিস।

আমাদের হেডমাস্টার ভবতারণবাবু বেশ কড়া মেজাজের লোক। তিনি আবার লোকও খুব ভাল। রায়বাবুর অভিযোগ শুনে তিনি আমাদের ডেকে পাঠালেন। আমরা ভয়ে ভয়ে গিয়ে হাজির হলাম।

হাতের বেতটা টেবিলের ওপর সজোরে মেরে তিনি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা পেয়ারা বাগানে ঢুকেছিলে ?

আমরা বললাম, ঢুকেছিলাম স্যার।

—কেন ঢুকেছিলে ?

আমরা তখন কি অবস্থায় কেন ঢুকেছিলাম সব কথা এক এক করে বলে গেলাম। আমরা ভাল ছেলে, কখনো মিথ্যা কথা

বলি না। আমরা তাই আগাগোড়া সত্যি কথা বলে গেলাম, প্রথম আরম্ভ থেকে শেয়াল ও দ্রাক্ষাফলের গল্প পর্যন্ত।
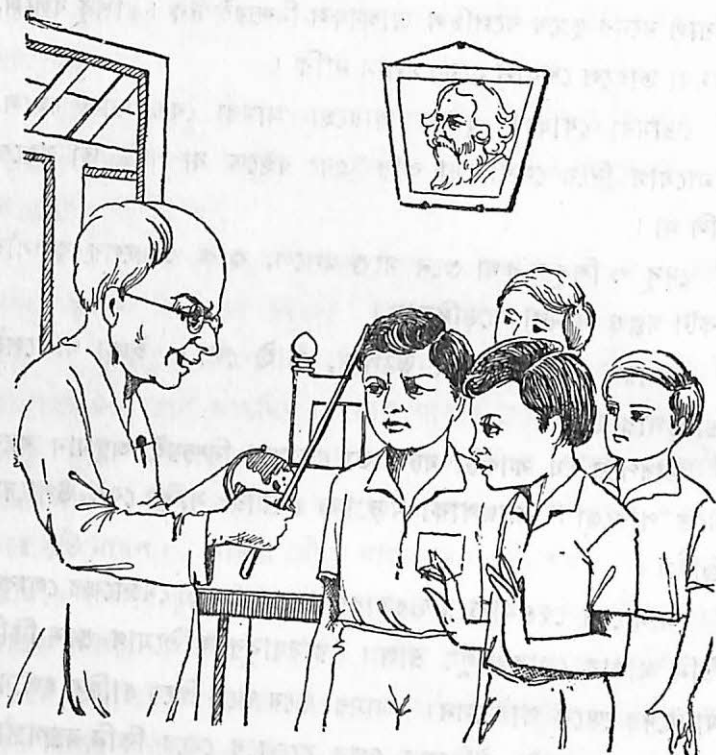
তোমরা পেয়ারা বাগানে গিয়েছিলে ?

দম নেবার জন্য থামতে হল। মংশু হঠাৎ বলে উঠল, সেই সময় স্যার প্রচণ্ড সাইক্লোন চলছিল, সব লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছিল।

আমাদের কথা শুনে হেডমাস্টার মশায় গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। রায়বাবুও চুপ করে সব শুনলেন।

দেবু সাহস করে বললে, আমরা যদি কোন অন্যায় করে থাকি স্যার তাহলে ক্ষমা চাইছি।

তিনি কিছুক্ষণ পরে বললেন, যাও, কখনো দুষ্টুমী করবে না।

স্কুল থেকে পালিয়ে

আমরা মাঝে মাঝে পিকনিক করতাম। তখন আমরা বেশ বড় হয়ে গেছি। আরো অনেক ছেলে আমাদের দলে যোগ দিয়েছে। তবে তারা আমাদের মত টো টো করে বেড়াতো না। তারা শুধু বসে আড্ডা দিত আর পিকনিকে উৎসাহ দেখাত।

মংশুদের একটা বাগান বাড়ী ছিল। আমাদের পিকনিক সেইখানেই সাধারণতঃ হত। মংশুর পিসিও আমাদের খুব উৎসাহ দিতেন। প্রথম প্রথম মংশুদের বাড়ী থেকেই সব খাবার রান্না করিয়ে বাগানে নিয়ে যাওয়া হত। পরে আমরা নিজেরাই রান্না করে নিতাম। সে এক অন্য রকমের মজা। প্রথম প্রথম সে যা রান্না হত তা মুখে দেবার যোগ্য হত না। তাই বলে কেউ মুখ বিকৃত করতে পারত না। পরে মংশু ও আমরা এবং আরো অনেকে বেশ পাকা রাঁধুনী হয়ে গিয়েছিলাম। মজা এবং আনন্দ দুই-ই হত।

একটু উঁচু ক্লাশে উঠবার পর আমরা মাঝে মাঝে স্কুল পালাতে আরম্ভ করলাম। এরজন্য আমাদের কিন্তু কোন দোষ ছিল না। আমরা সবাই ভাল ছেলে, কোনরকম দুর্বুদ্ধি আমাদের মনে ছিল না। তবে আমরা একেবারে বোকাও ছিলাম না।

টিফিনের সময় কয়েকজন ফিরিআলা আলুকাবলি, ফুচকা, চিনাবাদাম, আইসক্রীম প্রভৃতি নিয়ে আমাদের স্কুলের ভেতরে

টিফিনের সময় ফুচকা খেতে বেরলাম

আসতো। আমাদের স্কুলের কর্তৃপক্ষ একদিন ওদের স্কুলের ভেতরে আসা বন্ধ করে দিলেন। ওরা তখন স্কুল গেটের বাইরে রাস্তার

ধারে ওদের দোকান সাজিয়ে বসতো। টিফিনের সময় আমাদের স্কুল গেটের বাইরে গিয়ে আলুকাবলি, ফুচকা প্রভৃতি কিনতে দেওয়া হত। আচ্ছা বলতো স্কুল পালাবার এরকম সুযোগ যদি স্কুল কর্তৃপক্ষ করে দেন তাহলে আমাদের কি দোষ হতে পারে।

তবে আমরা তো ভাল ছেলে। আমাদের মনে এরকম দুবুর্দ্ধি কোন দিন আসতো না। তাছাড়া টিফিনের সময় আমরা কেউই টিফিন খেতাম না। আমি তো টিফিনের পয়সা স্কুলে আসবার আগেই খরচ করে ফেলতাম।

একদিন মংশু বললে, আমার পকেটে একটা টাকা আছে, আমি কিছুতেই খরচ করতে পারছি না।

আমরা তখন বললাম, তাহলে এক কাজ করা যাক। আজ টিফিনের সময় সবাই মিলে ফুচকা খাওয়া যাবে।

এই কথা মত টিফিনের সময় আমরা ফুচকা খেতে বের হলাম। ফুচকা খেতে খেতে ঘণ্টা বেজে গেল। সবাই স্কুলের ভেতর চলে গেল, আমরা বাইরে রয়ে গেলাম।

মংশু বললে, আর স্কুলে গিয়ে কাজ নেই। চল আমরা পালাই।

এই কাজে আমাদেরও একটু উৎসাহ জেগে উঠল। আমরা স্কুলের দেয়ালের পাশ দিয়ে স্কুলের পিছন দিকে চলে গেলাম। তারপর একটা মাঠ পার হয়ে একেবারে গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ ধরলাম। অনেক ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরে এলাম।

এরপর মাঝে মাঝে স্কুল পালাতে লাগলাম। একদিন তো

হাঁটতে হাঁটতে একেবারে নদীর ধারে এসে পড়লাম। সবাই বলে গঙ্গা, কিন্তু আসলে এটা হুগলি নদী। বিরাট নদী, এপার ওপার দেখা যায় না। ছোট ছোট অনেক নৌকো নানা রঙের পাল তুলে হেলে দুলে এদিক ওদিক চলেছে। সাদা পাল, নীল পাল, বাদামী পাল। নৌকোর পালকে মাঝিরা বাদাম বলে। বাদামী রঙের পালই বেশী দেখা যায়, তাই বোধহয় বাদাম নামটা হয়েছে। অথবা সাদা পাল ব্যবহার করতে করতে বাদামী রঙের হয়ে যায়, এ থেকেও বাদাম নামটা হতে পারে।

নদীর ধারের দৃশ্য অপূর্ব, অপরূপ। দেখে দেখে আমাদের মন খুশিতে ভরে উঠল।

একদিন আমরা একটা জাহাজও দেখেছিলাম। সত্যিকারের সমুদ্রে যাবার জাহাজ। প্রকাণ্ড জাহাজ যেন বিরাট এক ভাসমান প্রাসাদ। দুপাশে ঢেউ তুলে মন্থর গতিতে চলেছে। সেই ঢেউয়ে সব নৌকোগুলো নাচছিল। দেখে দেখে চোখ আর ফেরতে পারলাম না।

এই জায়গাটা আমরা চিহ্নিত করে রাখলাম। সপ্তাহে না হয় মাসে একদিন এখানে আমরা চলে আসতাম। একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় হাত পা ছড়িয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকতাম। পকেট ভর্তি চিনাবাদাম না হয় ছোলা ভাজা থাকতো। আমাদের ছেলেবেলার এ ছিল এক আনন্দ-অভিযান।
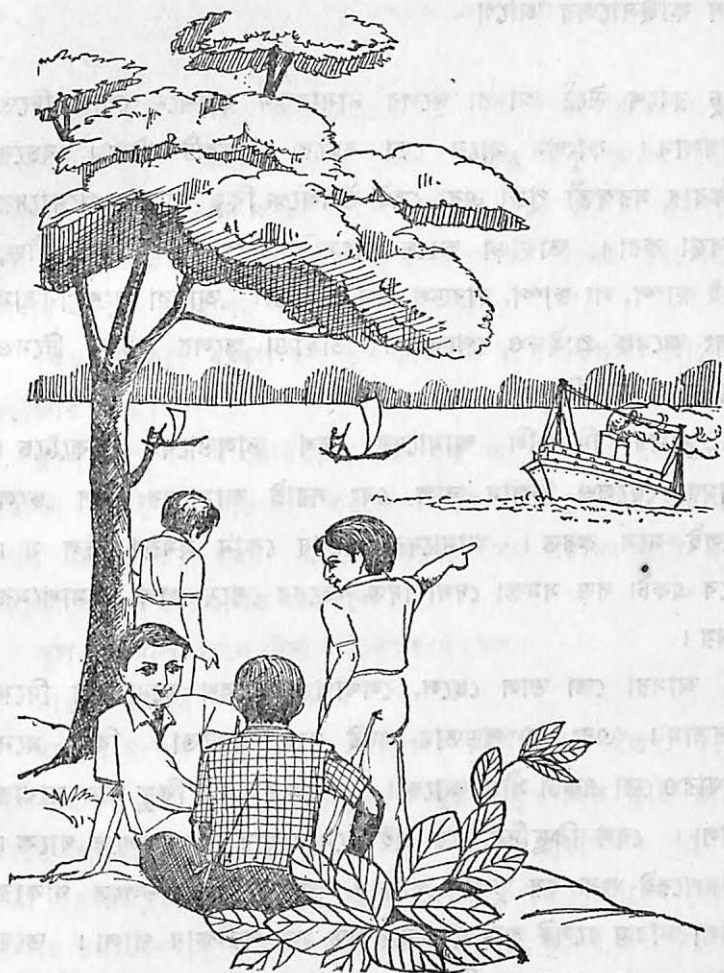
কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় হাত পা ছড়িয়ে বসতাম

স্কুল ফাইনালের আগে

উঁচু ক্লাশে উঠে আমরা স্কুলের নানারকম ফাংশনে যোগ দিতে লাগলাম। ফাংশন মানে তো বছরে কয়েকটি ঘটনা। বছরে একবার সরস্বতী পূজা এবং সেই উপলক্ষে কিছু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা। তাছাড়া আছে বাৎসরিক স্পোর্টস। লম্বা দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প, হারডল রেস প্রভৃতি। আমরা অংশ নিতাম এবং অনেক প্রাইজও পেয়েছি। তাছাড়া স্কুলের ফুটবল টিমেও আমাদের নাম ছিল।

স্কুলের দিনগুলি আমাদের বেশ ভালভাবেই কেটেছে। আমরা ছেলেও ছিলাম ভাল এবং সবাই আমাদের ভাল ছেলে বলেই মনে করত। আমাদের বিশেষ কোন সমস্যা ছিল না। তবে একটা বড় সমস্যা দেখা দিত বছরের শেষে ক্লাশ প্রমোশনের সময়।

আমরা তো ভাল ছেলে, লেখাপড়াও বেশ মনোযোগ দিয়ে করতাম। এবং যা পড়তাম সবই মনে থাকতো। কিন্তু মনে রাখারও তো একটা সীমা আছে। প্রথমে হল সব কিছু মনে রাখার পালা। বেশ কিছুদিন ধরে এই মনে রাখার পালা চলতে থাকে। তারপরেই শুরু হয় ভুলতে থাকার পালা। আর ভুলতে থাকার পালা আরম্ভ হলেই শুরু হয়ে যায় যত সব পরীক্ষার পালা। তবে আমরা ভুলতে ভুলতেও কিছুটা মনে রাখতে পারতাম তাই পরীক্ষায় কোন রকমে পাশ নম্বর পেয়ে যেতাম। কিন্তু মংগু একেবারে সব ভুলে ল্যাবেণ্ডিস হয়ে বসে থাকতো। তাই আসল সমস্যাটা হত

মংশুকে নিয়ে। আমরা প্রমোশন পেয়ে যাব আর মংশু পাবে না, এতো হতে পারে না।

নীচের ক্লাশে বিশেষ অসুবিধা হত না। মাস্টারমশায়দের একটু ধরাধরি করলেই কাজটা হয়ে যেত। কিন্তু উঁচু ক্লাশে বেশ কড়াকড়ি হত। তখন মংশুর পিসিকে গিয়ে ধরতে হত। একবার তো মংশুর জন্য একজন গৃহশিক্ষকই রাখা হল। তিনিই চেষ্টা করে সেবার মংশুকে প্রমোশন পাইয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু সবচেয়ে মুস্কিল হল স্কুল ফাইনাল বা সেকেণ্ডারী বোর্ডের পরীক্ষার সময়।

ক্লাশ টেনে যে বাৎসরিক পরীক্ষা হয় তাকে বলা হয় টেস্ট পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে তাকে বোর্ডের পরীক্ষা দিতে এলাউ করা হয়। এইটেই স্কুলের শেষ পরীক্ষা তাই এই পরীক্ষাকে স্কুল ফাইনালও বলা চলে।

স্কুল ফাইনাল, মানে টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেল।

মংশুকে এলাউ করা হল না।

আমরা মংশুর জন্য একটা ডাক্তারী সার্টিফিকেট তৈরী করে ফেললাম। টেস্ট পরীক্ষার সময় মংশু খুব অসুস্থ ছিল তাই ভাল করতে পারেনি। কোন ফল হল না। মংশুর গৃহশিক্ষক অনেক চেষ্টা করলেন, কোন ফল হল না। মংশুর পিসি আমাদের হেড-মাস্টার ভবতারণবাবুকে নেমতন্ন করে খাওয়ালেন, স্কুলের জন্য অনেক কিছু করে দেবেন বললেন, মংশুর জন্য আরো একজন গৃহশিক্ষক রাখবেন বললেন, তাতেও কোন ফল হল না।

এরকম বিপদে আমরা আর কখনো পড়িনি। আমাদের ঘন ঘন

মিটিং হতে লাগল। মংশুর মত আরো পাঁচটি ছেলেকে এলাউ করা হয়নি। তারাও একে একে আমাদের মিটিং-এ আসতে লাগল। ক্লাশ এইট ও নাইনের অনেক ছেলের প্রমোশন আটকে আছে। তারাও আনাগোনা করতে শুরু করল। আমরা ক্রমেই দলে ভারী হতে লাগলাম।

এমত অবস্থায় মংশু বললে, এবার আমাদের একটা ডিরেক্ট অ্যাকশন নেবার প্রয়োজন হবে।

সবাই উৎসাহ দেখাল, হ্যাঁ, ডিরেক্ট অ্যাকশন চাই।

কি ধরনের ডিরেক্ট অ্যাকশন হবে বা হতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাই আমরা সবাই অধীর আগ্রহে মংশুর দিকে চেয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ ভেবে মংশু বললে, শোন, আমরা একটা প্রসেশন বার করব। নিশান উড়িয়ে ধ্বনি দিতে দিতে সারা গ্রাম ঘুরব। আমাদের ধ্বনি হবে টেস্ট পরীক্ষায় আটকানো চলবে না, প্রমোশন দিতে হবে, আমাদের দাবী মানতে হবে, এইরকম সব। তোমরা রাজী?

সবাই মহা উৎসাহে রাজী হয়ে গেল।

তখনি প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়ে গেল। নিশান তৈরীর জন্য লাল-নীল ঘুড়ির কাগজ কেনা হল। তাদের গায়ে বড় বড় হরপে লেখা হল আমাদের দাবী মানতে হবে, ইত্যাদি। তারপর বাঁশের কঞ্চির মাথায় আঠা দিয়ে নিশান লাগান হল। তারপর আমরা নিশানগুলো কাঁধে করে ধ্বনি দিতে দিতে আমাদের যাত্রা শুরু করলাম।

আমরা গ্রামের রাস্তা দিয়ে বাজার পর্যন্ত সর্বত্র কয়েকবার

প্রমোশন দিতে হবে আটকে রাখা চলবে না

ঘুরলাম। চেঁচাতে চেঁচাতে অনেকের গলা ভেঙ্গে গেল। দিনের শেষে আমরা বীরের মত যে যার বাড়ী ফিরে গেলাম।

এরকম প্রসেশন আমাদের গ্রামে এর আগে কখনো হয়নি। তাই বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল।

ছেলেদের গার্জেনরা, সকলে নয় তবে অনেকে এবং স্কুলের মাস্টারমশায়রা আলোচনায় বসলেন এবং অনেক আলোচনা করলেন। আমরা অবশ্য কিছু টের পেলাম না। তার পরদিন হেডমাস্টারমশায় আমাদের ডেকে পাঠালেন।

আমরা সবাই গেলাম। একটু ভয় ভয়ও করছিল। হেডমাস্টার-মশায় গম্ভীর মুখে বসেছিলেন। দেখে বোঝা গেল বেশ রাগ করে আছেন। অন্য মাস্টাররাও বসেছিলেন। আমাদের দেখে বেশ

ভৎর্সনার সুরে বললেন, এসব কি হচ্ছে! তোমরা ভেবেছো কি!

বকুনি খেয়ে আমরা থমকে গেলাম। কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না। মংশু তাই বেশ সাহস করে এবং খুব বিনীতভাবে বললে, স্যার, আমরা সবাই খুব ভাল ছেলে। পরীক্ষার সময় শুধু মাথাটা কিরকম গোলমাল হয়ে যায়। এবার আমরা স্যার দিনরাত বই নিয়ে পড়াশুনা করব এবং বোর্ডের পরীক্ষায় নিশ্চয়ই খুব ভালভাবে পাস করে যাব। তাই স্যার…

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর একজন মাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কজন?

মংশু বললে, আমরা ছ জন স্যার।

অন্য একজন মাস্টার তখন অন্য ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা কি চাও?

ক্লাশ নাইনের একটি ছেলে বললে, আমরা স্যার সবাই ভাল ছেলে। খুব মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করব। আমাদের প্রমোশনটা স্যার…

হেডমাস্টার গর্জন করে উঠলেন, চুপ কর।

তারপর মংশুকে বললেন, তোমরা যেতে পার। বোর্ডের পরীক্ষায় যদি কেউ ফেল কর তাহলে এই স্কুলে তোমাদের আর জায়গা হবে না, মনে রেখো। এখন যাও। এই বলে তিনি হাতের বেতটা সজোরে টেবিলের ওপর মারলেন।

আমরা আর সেখানে দাঁড়ালাম না। সোজা চলে গেলাম একেবারে নবীনবাবুর চায়ের দোকানে। সেইখানেই আমাদের জয়ের আনন্দ জমে উঠল।

স্কুল ফাইনালের পরে

আমরা বোর্ডের পরীক্ষা দিলাম। বেশ উৎসাহ এবং উদ্দীপনার ভেতর দিয়ে পরীক্ষার দিনগুলি কাটল। পরীক্ষার পরে কয়েক মাসের অবসর। আমরা বেশীর ভাগ সময় মংশুদের বাড়ীতে কাটাতাম। হয় ক্যারম কিম্বা লুডো খেলতাম, না হয় নানারকম কল্পনা জল্পনা করতাম। কখনো টোটো করে বেড়াতাম, একেবারে নদীর ধারে চলে যেতাম। পরীক্ষার রেজাল্টের কথাও মাঝে মাঝে উঠত। মংশু বলতো তোরা তো পাশ করে যাবি, আমি ফেল করে একা পড়ে থাকব। আমরা আশ্বাস দিয়ে বলতাম, পরীক্ষার কথা কেউ বলতে পারে না। অনেক সময় ভাল ছেলেরাও ফেল করে বসে। মংশু আবার বলত রেজাল্ট যাই হোক আমরা বন্ধু, বন্ধু হিসাবেই থাকব।

উৎকণ্ঠা বলে একটা কথা আছে। আমরা তা কোনদিন অনুভব করিনি। এইবার একটু একটু অনুভব করতে লাগলাম। পরীক্ষার ফল বের হবার দিন যত ঘনিয়ে আসতে লাগল, আমাদের উৎকণ্ঠা ততই বাড়তে লাগল। বুকের ভিতরটা সব সময় দুরু দুরু করত, কি জানি কি হয়। মন খুলে আর আড্ডা দিতেও পারতাম না।

অবশেষে একদিন পরীক্ষার ফল বের হল। যা আশংকা করেছিলাম তাই হল। মংশু পাশ করতে পারেনি।

স্কুলের নোটিশ-বোর্ডটা আমরা ভাল করে কয়েকবার পড়লাম। মংশুর নাম কোথাও পাওয়া গেল না। রেজাল্ট জানতে মংশু স্কুলে আসেনি। আশা করে বাড়ীতে বসে আছে। আমরা গিয়ে মংশুকে জানাব। এখন এই দুঃসংবাদ নিয়ে মংশুর কাছে যেতে হবে। এরকম বিপদে আমরা কেউ কখনো পড়িনি।

শিবু বলেই ফেলল, আমি যেতে পারব না, তোরা যা।

আমি বললাম, সেটা আরো খারাপ হবে।

দেবু বললে, মংশুকে একটু প্রবোধ দেওয়া দরকার, তাই আমাদের তিনজনকেই যেতে হবে।

আমরা গম্ভীর মুখে মন্থর গতিতে মংশুদের বাড়ী গেলাম। মংশু বাইরের ঘরেই বসেছিল। আমাদের শুকনো মুখ দেখে বলে উঠল, কিরে তোরাও আমার মত লাড্ডু পেয়েছিস নাকি!

আমি বললাম, নারে তোর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলাম কই।

মংশুর রাগ কোনদিন দেখিনি, এবার দেখলাম। রাগে মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল, তা পারবে কেন, যত সব। তোরা বন্ধু হয়ে আমাকে এরকমভাবে ডোবাবি, ভাবতে পারিনি। তোরা সব ট্রেটর, বিশ্বাসঘাতক—

মংশুকে ঠাণ্ডা করবার জন্য বললাম, তুই মিছিমিছি রাগ করছিস। এটা তো স্কুলের পরীক্ষা নয়, বোর্ডের পরীক্ষা। আমরা কী করতে পারতাম।

মংশু বলে উঠল, থাক আর দাঁত দেখাতে হবে না। কেন, তোরাও তো ফেল করতে পারতিস। এটা তো খুব শক্ত কাজ নয়।

শিবু বললে, তুই এত রাগ করছিস কেন! এক বছর পরেই তো তুই আবার আমাদের সমান হয়ে যাবি। বারে বারে তো কেউ ফেল করে না।

দেবু বললে, আর একটা বছর তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

মংশুর রাগ কমলো না। বললে, থাক তোদের আর ভালমানসি দেখাতে হবে না। তোদের আমি চিনে নিয়েছি।

এই বলে মংশু বাড়ীর ভেতর চলে গেল। আমরা চুপ করে বসে রইলাম।

অনেকক্ষণ কেটে গেল মংশু আর আসে না। দেবু রাগ করে বললে, চল, আমরা চলে যাই।

একটা বিশ্রী মন নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম। বোর্ডের পরীক্ষায় পাশ করেছি, তার জন্য যে আনন্দ হবার কথা, তা ঠিক মত হল না। একটা ভারী মন নিয়ে কলকাতা যাবার আয়োজন করতে হল। এইভাবে যে বন্ধু বিচ্ছেদ হবে তা ভাবতেও বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

কলকাতায় কলেজে ভর্তি হবার দিন ঘনিয়ে আসছে। মংশুর পিসি আমাদের নেমন্তন্ন করলেন ডাল-ভাত খাবার। নেমন্তন্ন পেয়ে আমরা খুব খুশি হলাম। মংশুকে তাহলে আবার পাওয়া যাবে।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মংশুই হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা করল। ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে বললে, সেদিন তোদের অনেক কটু কথা বলেছি। তোরা রাগ করিসনি তো।

আমি ওর হাতটা খুব শক্ত করে ধরে বললাম, তোর উপর কি রাগ করা যায়।

আমরা পাশ করেছি তাই মংশুর পিসি খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। কথায় কথায় বললেন, তোমরা তোমাদের বন্ধুটিকে টেনে নিতে পারলে না।

আমরা বললাম, এইবার পারব। আপনি ওর ওপর একটু নজর রাখবেন।

নেমন্তন্ন ছিল ডাল-ভাতের। কিন্তু আমরা ভাতও পেলাম না,

ডালও পেলাম না। পেলাম পোলাও মাংস মাছ ভাজা চাটনি ইত্যাদি। দই মিষ্টির কথাটা না হয় নাই বললাম।
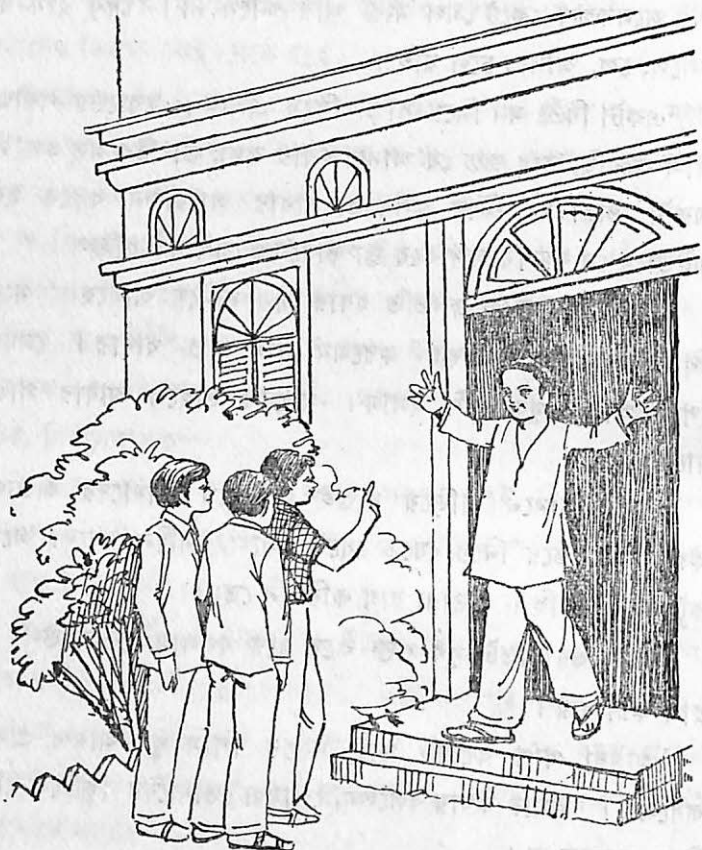
মংশু দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করল

খাবার পর কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে এবার বেশ হাল্কা মনেই বাড়ী ফিরলাম।

কলকাতা যাবার দিন মংশু স্টেশনে এল আমাদের সি অফ করতে। হাসি মুখেই আমরা আলিঙ্গন করলাম। মংশুও হাসতে হাসতে বললে, আমি একেবারে একা হয়ে গেলাম রে। ওর চোখ দুটো ছলছল করছিল।

আমরা বললাম, আমরা তো আর একেবারেই চলে যাচ্ছি না। ছুটি পেলেই তো চলে আসব।

গাড়ী এক মিনিটের বেশী দাঁড়ায় না। আমরা চটপট গাড়ীতে উঠে পড়লাম। রুমাল দিয়ে আমাদের চোখ মুছতে দেখে মংশু চেঁচিয়ে বলে উঠল, এই চোখের জল ফেলবি না। সবসময় হাসি মুখে থাকবি।

গাড়ী চলতে লাগল। যতক্ষণ গাড়ীটাকে দেখা যাচ্ছিল মংশু প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়তে লাগল।

আমরা অন্তরঙ্গ হলাম

কলকাতায় আমরা একই কলেজে ভর্তি হলাম। শিবু ও দেবু সায়েন্স নিল, আমি নিলাম কমার্স। কলেজের একই বোর্ডিং-এ আমরা থাকবার জায়গা পেয়ে গেলাম। তিন বন্ধু একসঙ্গে আছি তবু মাঝে মাঝে হোমসিক হয়ে পড়তাম। বাড়ীর জন্য মন কাঁদতো। তাই সামান্য দু-চার দিনের ছুটি পেলেই বাড়ীর দিকে দৌড়তাম। আর বাড়ী গেলেই মংশুর সঙ্গে দেখা হত। আসলে আমি টের পেয়ে গেলাম যে কলকাতার কলেজের আকর্ষণের চাইতে গ্রামে মংশুর আকর্ষণ অনেক বেশী।

দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল। এবারও মংশু স্কুল ফাইনাল পাশ করতে পারল না। ওকে অনেক বোঝালাম। কিন্তু লেখাপড়ার কথা তুললেই ও ভয়ানক রেগে যেত।

পরের বছর আমরা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করলাম। শিবু ডাক্তারী পড়তে নীলরতনে ভর্তি হল আর দেবু ইলেকট্রনিক্স পড়তে যাদবপুর চলে গেল। আমি বি. কম পড়বার জন্য একা বোর্ডিং-এ রয়ে গেলাম। মংশু এবারও স্কুল ফাইনাল পাশ করতে পারল না।

মংশু মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতো। আর আসলেই আমাদের সঙ্গে দেখা করতো। এবার এসে শুধু আমাকে দেখে বললে, ওরা কোথায় ?

জবাবে আমি বললাম, তুইও একাকী, আমিও একাকী।

আমরা দুজনে খুব হাসাহাসি করলাম। পরে মংশু বেশ দার্শনিক হয়ে উঠল। বললে, জীবনটাই এইরকম, কেউ কারো জন্য অপেক্ষা করে না।

ক্রমে মংশুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল। এখন আমি আর মংশু এবং মংশু আর আমি। লেখাপড়ার কথা বললে মংশু রাগ করে তাই আমরা আর লেখাপড়ার কথা নিয়ে আলোচনা করতাম না। তাছাড়া আলোচনার তো কত বিষয় রয়েছে। সিনেমা, রেস্তোরাঁ, ফুটবল, একজিবিশন এবং আরো কত কি। এইসব নিয়ে আমাদের আলোচনা এবং গবেষণা হত। তাছাড়া আর একটা গবেষণা করবার মত বিষয় আমরা পেয়ে গেলাম। তখন আমাদের সবেমাত্র গোঁপের রেখা দেখা দিতে শুরু করেছে। তাই গবেষণার বিষয় হল গোঁপ রাখা ভাল না জুলপি রাখা ভাল। একদিন সিদ্ধান্ত হয় দুটোই

রাখা ভাল। অন্য দিন সিদ্ধান্ত হয় কোনটাই রাখা উচিত হবে না। আবার কোনদিন একটা আপোষ-মীমাংসা হয় দুটোর একটা রাখা ভাল।

বি. কম পাশ করে আমি বিজিনেস অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে নাম লেখালাম। মংশু আগের মতই আছে। মংশুর জন্য মাঝে মাঝে বেশ চিন্তা হয়। তবে বড়লোকের ছেলে সুতরাং…

একটা ভাল চাকরী পেয়ে গেলাম। এখন তাই আর কলেজের বোর্ডিং-এ থাকা চলে না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা ভাল থাকবার জায়গা পেয়ে গেলাম। এটা ঠিক হোটেল নয়, আবার একে বোর্ডিংও বলা চলে না। দুটোর মাঝামাঝি একটা থাকবার ও খাবার জায়গা। একটা উচ্চাঙ্গের মেস বলা যেতে পারে। আমি একা একটা ঘর পেয়ে গেলাম।

আমার ঘরটা দেখে মংশু খুব খুশি হল। ওর এত পছন্দ হয়ে গেল যে ও নিজে থেকেই ঘরটাকে সাজাবার কাজে লেগে গেল। জানালায় দরজায় পরদা লাগাল, গদি আঁটা চেয়ার আমাকে দিয়ে কেনাল, একটা ড্রেসিং টেবল, বুক সেল্‌ফ এবং আরো অনেক কিছু দিয়ে বেশ সুন্দরভাবে ঘরটাকে সাজিয়ে দিল। তারপর বললে, এই এতদিনে আড্ডা দেবার মত একটা ভাল জায়গা পাওয়া গেল।

বললাম, মাঝে মাঝে আসবি কিন্তু।

মংশু বললে, মাঝে মাঝে কেন এখন ঘন ঘন আসতে থাকব।

মংশু সত্যি সত্যি বেশ ঘন ঘন আসতে লাগল। আমরা দিন দিন বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম।

এখন মংশু আমাকে অনেক মনের কথা বলে। একদিন মংশু

কথায় কথায় বললে, জানিস বুদ্ধু, আমার মাথায় নানারকম প্ল্যান আসছে কিন্তু কোনটাই স্পষ্ট হচ্ছে না। তাছাড়া লাখ লাখ টাকা দরকার নইলে কিচ্ছু করবার উপায় নেই।

আমি বললাম, তুই নিজে লাখপতির ছেলে, তোর পিসিও লাখপতি। তুই তাহলে টাকা টাকা করছিস কেন?

মংশু কথাটা এড়াবার জন্য বললে, সেসব তুই বুঝবি না।

বুঝতে পারলাম না ঠিকই। তবে আমার মনে হয় ও বিরাট কিছু একটা করবার মতলবে আছে। লেখাপড়া তো হল না। এখন যদি কোন কারবারে মনোনিবেশ করতে পারে ভালই হবে। অনেক দুশ্চিন্তা আমাদের কমবে। তাই একদিন বলেছিলাম, আমি তোকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারি?

আমার কথা শুনে মংশু হো হো করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, তুই কী সাহায্য করবি রে।

এই যাঃ ফস্কে গেল

কাঁধে ঝোলানো থলি কাঁধে মংশু এল। পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বলে উঠল, এই যাঃ ফসকে গেল।

আমি একটা বই-এর পাতা থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলাম, কি ফসকে গেল রে?

মংশু গদি আঁটা আরাম কেদারাটায় বসে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, বাসটা।

বইটা বন্ধ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, কোথাও যাচ্ছিলি নাকি !
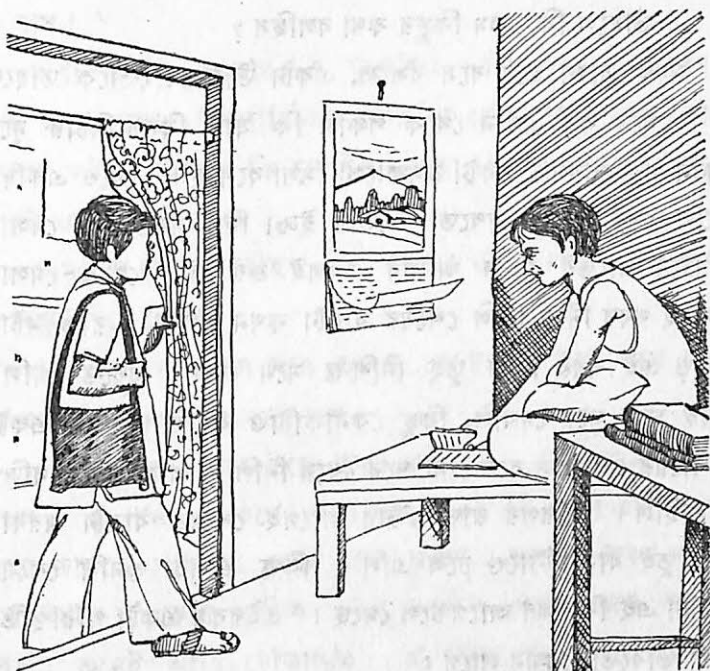
এই যাঃ ফস্কে গেল

মংশু একথার কোন জবাব দিল না। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, তোর এরকম কখনো হয়েছে ?

বললাম, কি রকম !

—এই-ধর, একটা বাস ধরতে ধরতেও ধরতে পারলি না।

—এ তো হামেশাই হচ্ছে। আর এই জন্য আমি বাসেই উঠি না। আমি ট্র্যাম গাড়ীটাই পছন্দ করি।

মংশু বলে উঠল, আরে না না, এরকম কিছুর কথা আমি বলছি না।

—তাহলে কি রকম কিছুর কথা বলছিস?

মংশু সোজা হয়ে বসে বললে, একটা উদাহরণ তোকে তাহলে দি। মনে কর এখান থেকে পঞ্চাশ কি ষাট কিলোমিটার দূরে কোন এক জায়গায় একটা জমকালো মেলা বসেছে। তুইও একদিন গেলি সেই মেলা দেখতে। তোর ইচ্ছা ছিল সমস্ত দিন মেলায় কাটিয়ে রাতেই ফিরে আসবি। সেই জন্য বাস থেকে মেলায় নেমেই খবর নিয়ে নিলি শেষের বাসটা কখন ছাড়ে। রাত নটায় ছাড়ে এই খবর নিয়ে তুই নিশ্চিন্ত মনে মেলায় ঘুরতে গেলি। সবই ঘুরে ঘুরে দেখলি, কিছু কেনাকাটাও করলি তারপর একটা খাবারের দোকানে বসে পেট ভরে খেয়ে নিলি। বারে বারে ঘড়িও দেখছিলি। তারপর রাত ন'টার আগেই শেষের বাসটা ধরবার জন্য তুই বাস স্ট্যাণ্ডে চলে এলি। কিন্তু এসেই শুনলি শেষের বাসটা এই কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে। এইরকম একটা পরিস্থিতির কথা ভাবতো, কেমন লাগে!

বলে উঠলাম, ওরে বাবা! কি সাংঘাতিক অবস্থা, ভাবতেও ভয় করে।

মংশু ম্লানমুখে হেসে বললে, ঠিক এইরকম একটা পরিস্থিতি আমার হয়েছে।

আমি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলাম, কি সাংঘাতিক, বলিস কিরে! কবে কোথায় এ ঘটনা ঘটেছিল। তখন তুই কি করলি! সঙ্গে টাকাকড়ি ছিল তো!

মংশু হেসে বললে, দূর বোকা। তুই একটা সাধারণ উদাহরণ বুঝিস না। এই রকম পরিস্থিতির ইংরাজী নাম হল মিসিং দি বাস।

মাথা চুলকে বললাম, ও বুঝেছি। এটা একটা উদাহরণ। তার মানে পঞ্চাশ কিলোমিটার, মেলা বা শেষ বাসের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আসলে কি হয়েছিল বলতো? তার আগে চা খেয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নে।

আমাদের মেসের হরিহর বেশ কাজের লোক। সে ইতিমধ্যে চা-বিস্কুট দিয়ে গেছে।

এক ঢোক চা গিলে মংশু বললে, সে দুঃখের কথা শুনে আর কি করবি। তবু বলি, শুনে রাখ।

এই বলে মংশু নড়ে চড়ে বসল এবং চায়ের কাপে মনোনিবেশ করল। চা পান শেষ করে বলতে লাগল, একদিন আমি এক বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলাম কোন এক স্থানে একলাখ টাকা মজুত হয়ে আছে। কোন মালিক নেই, নেবার কোন লোক নেই। খবরটা শুনেই আমি দৌড়ালাম। এ রকম সুযোগ তো ছাড়া যায় না। কিন্তু দুঃখের কথা কি বলব, আমার আগেই কে একজন টাকাটা হাতিয়ে নিয়েছে। বাস ফেল করার মত অবস্থা হল না?

মংশুর কথা শুনে মনে মনে বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলাম। বারে বারে পরীক্ষায় ফেল করে শেষে কি ওর মাথাটা গোল হয়ে যাচ্ছে! মংশু নিজে স্বীকার না করলেও ও যে প্রত্যেক বছর পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে সে খবর আমরা রাখতাম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মংশু বললে, কিরে বিশ্বাস হল না ?

বললাম, তোর কথা, বিশ্বাস না করে পারি ! তবে হজম করতে কত বড় হজমিগুলির প্রয়োজন হবে তাই ভাবছি ।

তাহলে এই নে তোর হজমিগুলি, এই বলে মংশু তার পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে আমার হাতে দিল ।

কাগজটার ভাঁজ খুলে দেখি একটা লটারীর টিকেট । মংশু আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, এই ছ্যাখ, পরিষ্কার ছাপার অক্ষরে লেখা আছে প্রথম পুরস্কার এক লাখ টাকা । এখন বিশ্বাস হল তো ।

বললাম, তা না হয় হল, কিন্তু…

—আবার কিন্তু কি । প্রথম পুরস্কার এক লাখ টাকা কেউ না কেউ পাবেই । সেই কেউ আমিও তো হতে পারতাম । কিন্তু পারলাম না, মানে ফস্কে গেল । একেই বলে মিসিং দি বাস ।

আরাম কেদারায় আরাম করে হেলান দিয়ে চোখ ছটোকে অর্ধনিমিলিত করে মংশু আবার দার্শনিক হয়ে উঠল । বললে, দিন-কাল বড়ই খারাপের দিকে যাচ্ছে রে । লাখ লাখ টাকার প্রয়োজন নইলে কিছুই করবার জো নেই ।

বলতে বলতে মংশু ধ্যানমগ্ন হল ।

ওর ধ্যান ভঙ্গ করবার জন্য বললাম, তুই একটা চাকরী করবি ? তোকে আমি একটা খুব ভাল চাকরী পাইয়ে দিতে পারি ।

মংশু রীতিমত আঁৎকে উঠল । বললে, চাকরী ? বলিস কিরে ! একবার অফিসে কেরানি হয়ে ঢুকলে সারা জীবন কেরানি হয়ে থাকতে হবে । তুই আমার বন্ধু হয়ে আমার এ রকম সর্বনাশ

করিস না। আমার সমস্ত স্বপ্ন একেবারে চুরমার হয়ে যাবে।

আমিও বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। বললাম—না, এমনি কথার কথায় বলছিলাম। তুই বিরাট একটা কিছু করবার পরিকল্পনা করছিস তা একটু একটু বুঝতে পারছি। কিন্তু তুই তো মন খুলে কিছু বলবি না, তাই একটু চিন্তা হয়। আমরা তোর বন্ধু। আমরাও তো তোকে অনেকভাবে সাহায্য করতে পারি।

মংশু গভীর চিন্তা করে বললে, আমি নিজেই অন্ধকারে আছি, তোদের কি বলব। তবে তোদেরও সাহায্য প্রয়োজন হয়ত হবে।

মংশু উঠে পড়ল। বললে, আজ যাই। আর একদিন এসে অনেক কিছু আলোচনা করব।

শঙ্খচিলের সন্ধানে

রবিবার। ছুটির দিন। অফিসে যাবার তাড়া নেই। অতএব প্রাত্যহিক কোন কাজেরও কোন তাড়া নেই।

সকাল বেলার চা পান করে অলস মনে রবিবারের দৈনিক পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিলাম। কতকগুলি বিজ্ঞাপন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

রবিবারের কাগজ বিজ্ঞাপনে ভরা থাকে। এই বিজ্ঞাপনগুলি পড়তে এবং দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। কত জিনিসের কত বিজ্ঞাপন। আবার কত রকমভাবে সাজানো।

যে বিজ্ঞাপনটা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল সেটা ছিল

একটা লটারীর বিজ্ঞাপন, রয়েল ভুটান লটারী। তারপর আরো অনেক লটারীর বিজ্ঞাপন দেখতে পেলাম, ত্রিপুরা লটারী, নাগাল্যাণ্ড লটারী, দিল্লী, উত্তর প্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং আরো অনেক। পশ্চিমবঙ্গ তো আছেই। কেউ প্রথম পুরস্কার দিচ্ছে এক লাখ টাকা, কেউ দিচ্ছে পাঁচ লাখ, একজন আবার সাত লাখ টাকাও দিয়েছে।

হ্যালো, গুড মর্নিং বলে মংশু ঘরে ঢুকল।

ওকে দেখে বললাম, তুমি খুব ভাল সময়ে এসে গেছ। তোমার কথাই বসে বসে ভাবছিলাম।

আমার কথা! মংশু অবাক হয়ে বললে, হঠাৎ আমি বিখ্যাত হয়ে গেলাম কিসের জন্য!

মংশুকে লটারীর বিজ্ঞাপনগুলি দেখালাম।

একটু হেসে মংশু বললে, ওঃ লটারী! তুই দেখছি এখনো সেই ছেলে মানুষটিই আছিস!

আমি অবাক হয়ে বললাম, সে কিরে! আমি তো ভেবেছিলাম তুই এখনো 'সেই কেউ আমিও তো হতে পারি'র দলে আছিস।

মংশু বললে, এখনো আছি তবে একটু অন্যরকমভাবে।

—তার মানে?

—এই সোজা কথাটা বুঝতে পারলি না। তাহলে শোন। ওরা তো মোটে একটা প্রথম পুরস্কার দেবে। কিন্তু তার জন্য অন্তত দশ লাখ টিকিট বিক্রী করবে। তার মানে দশ লাখে একজন প্রথম পুরস্কার পেতে পারে। তার আর একটা মানে হল এই দশ লাখে ন লাখ নিরানব্বই হাজার নশো নিরানব্বই জন প্রথম পুরস্কার নাও পেতে পারে। ঠিক কিনা।

—হিসেবটা তো ঠিক বলেই মনে হচ্ছে।

—তাহলে যে দলটা সংখ্যায় বেশী তাদের সঙ্গে থাকাই তো নিরাপদ হবে। তুই কি বলিস!

বললাম, তার মানে এই লাখ টাকার পিছনে তোর দৌড়নো শেষ হল। এক হিসেবে ভালই হল।

মংশু বলে উঠল, শুধু ভাল হল না, এখন দেখবি এই লাখ টাকাই আমার পিছনে দৌড়চ্ছে।

—ব্যাপারটা কি রকম যেন মনে হচ্ছে।

—মনে হবেই তো। এবার যা একখানা পরিকল্পনা মাথায় এসেছে, আরে সেই জন্যই তো তোর সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে এলাম।

ওর কথা শুনে আমি তাড়াতাড়ি আরাম কেদারাটা তোয়ালে দিয়ে ভাল করে ঝেড়ে মুছে দিয়ে বললাম—নে, ভাল করে আরাম করে বোস, তারপর বল তোর পরিকল্পনার কথা।

মংশু আরাম করে বসে বললে, তার আগে তুই এইগুলো ভাল করে দ্যাখ।

এই বলে সে তার ঝোলা থেকে কয়েকখানা কাগজ বের করে আমার হাতে দিল।

কাগজগুলো উলটে পালটে দেখলাম। মনে হল কয়েকটা নকশা আঁকা রয়েছে। কোন একটা বইতে এ রকম নকশা দেখেছি বলে মনে হল। তাই জিজ্ঞেস করলাম, কোন বই থেকে টুকেছিস?

—টুকব কিরে! এ আমার নিজের প্রত্যক্ষ অবলোকনের ফল।

—কিসের নকশা বল তো?

—কোন পাখির পালক বলে মনে হচ্ছে।

—পালক নয়রে, ডানা। রাজহাঁসের ডানা। কেন এই ডানা, এ দিয়ে কি হবে, কিছু বুঝতে পারলি ?

আমার কাছে বেশ একটা হেঁয়ালির মতই মনে হল। মাথা চুলকোতে লাগলাম। হঠাৎ আমার মাথায়ও একটা ব্রিলিয়েণ্ট আইডিয়া এসে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, রাজহাঁসের ডানা বললি না ?

—তাই তো বললাম।

আমি এবার আস্তে আস্তে নিজেকে শোনাবার জন্যই যেন হিসেব করতে লাগলাম, রাজহাঁস। রাজহাঁস হল সরস্বতীর বাহন। সরস্বতী হল বিদ্যার দেবী। অতএব তোর আবার লেখাপড়ার দিকে মন…

কথাটা শেষ করতে পারলাম না। মংশু রেগে লাল। চেঁচিয়ে বলে উঠল, তোর মাথা আর মুণ্ডু!

মংশুর মুখের দিকে তাকালাম। ও মুখ ঘুরিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল।

বুঝতে পারলাম একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছি। অনেকটা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেবার মত। নিজেকে খুব অপরাধী বলে মনে হল। অনুতপ্ত সুরে জিজ্ঞেস করলাম, রাগ করলি ?

মংশু কোন জবাব দিল না।

টেবিলে রাখা সিগরেট প্যাকেট থেকে একটা দেড়গজি সিগরেট বার করে ধরিয়ে নিঃশব্দে টানতে লাগল।

আমি এক দুই গুনতে লাগলাম। তারপর প্রসঙ্গটা অন্যদিকে

ঘোরাবার জন্য বললাম, চা খাবি?

মংশু নিরুত্তর, কোন জবাব দিল না।

তবু আমাদের লোকটাকে ডাকলাম, হরিহর!

হরিহর এসে হাজির হল। মংশু মুখ ঘুরিয়েই রইল। তাকিয়েও দেখল না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, চা না কফি?

কোন জবাব নেই।

হরিহর দাঁড়িয়েই রইল। আমিও চুপ করে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে হরিহরকে বললাম—না, তুই যা।

দুজনে চুপ করে বসে আছি। জানালায় কটা গরাদ আমার গোনা হয়ে গেল।

সিগরেটটা নিঃশব্দে শেষ করে মংশু সেটা অ্যাশট্রেতে ভাল করে গুঁজে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, তুই যে রকম একটি নীরেট গবেট, তোর ওপর রাগ করেও কোন লাভ নেই। নে, ডাক তোর হরিহরকে।

হরিহর এলে মংশু নিজেই অর্ডার দিল, ব্ল্যাক কফি এবং ফিঙ্গার চিপস।

কফি এল, ফিঙ্গার চিপসও এল।

একটা চিপ চিবুতে চিবুতে বললাম, ওসব পাখি, ডানা এখন থাকুক। তোর বিরাট পরিকল্পনার কথাটাই বল মনোযোগ দিয়ে শুনি।

এক ঢোক কফি গিলে মংশুর মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা হল। বললে, আরে বোকা, এই পাখির ডানাটাই তো হল আসল জিনিস।

আচ্ছা সে কথা থাক। তুই এখন বলতো পাখিরা তাদের ডানা দিয়ে কি করে ?

বললাম, এ আর এমন কি শক্ত প্রশ্ন। পাখিরা ডানা মেলে আকাশে উড়ে বেড়ায়।

—জবাবটা ঠিক হল না। পাখিরা ডানা ঝাপটিয়ে আকাশে ওড়ে আর ডানা মেলে আকাশে ভেসে বেড়ায়।

—ও তো একই কথা হল।

—না, এক কথা নয়। তা যাকগে, এনিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। আচ্ছা এখন বলতো মানুষেরও যদি পাখির মত ডানা গজায় তাহলে কি হয় !

হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্নে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলাম। বললাম—মানুষ তাহলে উটপাখি হয়ে যাবে।

এবার মংশু একটু অবাক হল। বললে উটপাখি হতে যাবে কেন ?

বললাম, উটপাখির ডানা আছে কিন্তু উড়তে পারে না। মানুষেরও তাই হবে।

—যাঃ তা হতে যাবে কেন ?

—বাঃ মানুষের ওজনটা দেখতে হবে না !

—ওজনে কিচ্ছু আসে যায় না, মংশু বেশ গম্ভীর মুখে বলল।

আমিও বললাম, বললেই হল।

—আমি এর প্রমাণ দেখাতে পারি, এই বলে মংশু তার ঝোলা থেকে একখানা রঙচঙে পুস্তিকা বার করে আমার হাতে দিল। আবার বললে, ভাল করে ছাখ।

পুস্তিকাটা নানা রঙে ছাপা এবং পাতায় পাতায় একটা বাস বা বেশ বড় মোটর গাড়ীর ছবি। ইংলণ্ডে ছাপা এই কথাটাও এক জায়গায় লেখা আছে। বিলেতে ছাপা তাই এত সুন্দর। আমাদের দেশেও আজকাল ছাপাখানার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং এরকম জিনিস আমাদের দেশেও ছাপা হতে পারে।

পুস্তিকাখানা উলটে পালটে দেখে মংশুর হাতে ফেরৎ দিয়ে বললাম, বাসটা বেশ সুন্দর। বিলিতি বাস বোধ হয়।

মংশু বললে, এটাকে বাস বলা যেতে পারে, তবে এটা ঠিক বাস নয়। এটার নাম হচ্ছে হোভার ক্রাফট।

বললাম, হোভার ক্রাফট?

—তুই এর নাম শুনিসনি! কি আশ্চর্য!

—আজকাল তো কত নতুন নতুন জিনিস বের হচ্ছে। সব কি মনে রাখা যায়।

মংশু বললে, তাহলে শুনে রাখ। হোভার ক্রাফট হল একরকম মোটর গাড়ী, বাসও বলা যায়। এটা হল এ যুগের বিস্ময়। গাড়ীটার মাথায় ডানা লাগানো আছে। এই ডানার সাহায্যে গাড়ীটা কিছু পথ উড়েও যেতে পারে। তাই পথে যদি কোন বাধা পায় তা অনায়াসে ডিঙিয়ে চলে যেতে পারে। শুধু তাই নয় ছোটখাট নদী-নালার ওপর দিয়েও উড়ে যেতে কোন অসুবিধা হয় না। জলাভূমির ওপর দিয়েও অনায়াসে চলে যায়। এখন একটা মোটরগাড়ী যদি দশ বারো জন লোক নিয়ে ডানার সাহায্যে উড়ে যেতে পারে তাহলে একজন মানুষ কেন পারবে না? ওজনের তো কোন কথাই উঠছে না।

এই বলে মংশু বিজয় গর্বে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললাম, তোর যুক্তি মেনে নিতে হল।

এইবার মংশু তার পরিকল্পনার কথা বলতে লাগল : তাহলে ভেবে ছ্যাখ, মানুষের জন্য যদি এরকম ডানা তৈরি করা যায়, মানুষের তাহলে কি উপকারটাই না হয়। আজকাল তো কলকাতা শহরে হামেশাই রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যাকে বলে জ্যাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটকে থাকতে হয়। ঘরমুখো বাঙালীর কি দুরবস্থা একবার ভেবে দেখ তো! এইরকম ডানা যদি তাদের কাছে থাকে তাহলে তারা অনায়াসে পথের বাধা ডিঙিয়ে চলে যেতে পারবে। আমরা তাই মানুষের জন্য ডানা তৈরি করবার একটা কারখানা খুলে দেব। ডানাগুলো হালকা হবে, ফোলডিং ছাতার মত ভাঁজ করে থলির ভেতর রাখা যাবে, ব্যাটারী সেলে চলবে। রাস্তা বন্ধ, জ্যাম, যান চলাচল অসম্ভব, কুচ পরোয়া নেই। থলি থেকে ডানা বের করে লাগিয়ে নিলাম, বোতাম টিপে দিলাম, ব্যস্ হাওয়ায় উড়ে ডানা ঝটপট করতে করতে জ্যাম পার হয়ে গেলাম। ঘরমুখো মানুষ সময়ের আগেই ঘরে ফিরে গেল। এরকম জিনিস করতে পারলে নিশ্চয়ই চলবে। আমরা প্রথম প্রথম খুব কম দাম রাখব। একজোড়া ডানা ব্যাটারী সমেত একশো টাকা মাত্র। তাহলে দেখতে দেখতে হাজারখানেক ডানা বিক্রী হয়ে যাবে। তুই কি বলিস?

আমি মনে মনে একটা হিসেব করে নিলাম। একশো ইনটু হাজার অথবা হাজার ইনটু একশো, যেভাবেই হিসেব করি না কেন সেই এক লাখেই পৌঁছতে হয়। সুতরাং লাখ টাকা এখনো মংশুকে ছাড়েনি। মুখে বললাম, শুধু ব্যাটারী হলে তো চলবে না, মোটরও

চাই যে।

—আরে মোটর তো ডানার গায়েই লাগানো থাকবে। না, ওটা কোন সমস্যা হবে না। আসল সমস্যা হল এই ডানা নিয়ে। মানুষের জন্য ডানা, চাটটিখানি কথা নয়। অনেক হিসেব করে এগুতে হবে। দ্য ভিনসি একবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি।

—দ্য ভিনসি! তিনি আবার কে?

মংশু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুই কী রে! লেওনার্ড দ্য ভিনসির নাম শুনিসনি। লেখাপড়া শিখে তোরা দিন দিন গাধা হয়ে যাচ্ছিস।

মংশুর ভর্ৎসনা হজম করে নিতে হল। আমাদের বিদ্যার দৌড় তো পাঠ্যপুস্তক পর্যন্ত। তার বাইরে যে অনেক কিছু আছে বা থাকতে পারে তা আমরা ভাবতেই পারি না।

মংশু বলেই চললো, তবে আমি ঠিক দ্য ভিনসিকে অনুসরণ করছি না। আমি আসল পাখি এবং তাদের ডানা স্টাডি করছি। কয়েকটা পাখি স্টাডি করেছি তবে মনে হয় আরো কয়েকটা পাখি ভাল করে দেখা দরকার।

ওকে একটু উৎসাহ দেবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, কি কি পাখি স্টাডি করেছিস?

—খুব বেশী পাখি দেখতে পাইনি। তবে রাজহাঁস আর মুরগি খুব ভাল করে দেখেছি। তাছাড়া কবুতর, চড়াই পাখি, দু-চারটে কাক, এই আর কি। আরো কয়েকটা দেখতে হবে।

কেন জানি মনে হল, বলে ফেললাম—শঙ্খচিল একটা ভাল

পাখি, স্টাডি করার মত।

আমার কথা শুনে মংশু লাফিয়ে উঠল। বললে, শঙ্খচিল! দি আইডিয়া। মনে হচ্ছে এইরকম একটা পাখিই আসলে দরকার। চিড়িয়াখানায় নিশ্চয়ই আছে। আমি এখনি চললাম।

এই বলে মংশু উঠে দাঁড়াল। যাবার সময় বারে বারে বলে গেল, খুব সাবধান। একটা কথাও ঘুণাক্ষরে যেন কেউ জানতে না পারে। আমার আইডিয়াটা কেউ যদি মেরে দেয় তাহলে সর্বনাশ! সাবধান, খুব সাবধান!

আমাকে সাবধান বাণী দিয়ে মংশু চলে গেল।

বসে বসে কিছুক্ষণ ভাবলাম। এটা একটা পাগলামী না এর পেছনে সত্যি সত্যি কিছু আছে। তবে আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগে কোন কিছুই অসম্ভব বলে মনে হয় না। টেবিল ফ্যান টর্চের ব্যাটারীতে চলবে এও তো বের হয়ে গেছে শুনেছি। কোনদিন হয়ত এমন কিছু বের হবে যা মানুষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে। কিছুই অসম্ভব নয়। বসে বসে এই সবই আবোলতাবোল ভাবছিলাম।

সেদিন রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম রঙ-বেরঙের ডানা লাগিয়ে অনেক ছেলেমেয়ে প্রজাপতির মত আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, খেলা করছে। এক সময় আমিও ওদের মত আকাশে উড়তে লাগলাম।

একটা পাখি এসে প্রশ্ন করল, তুমি কে গা?

আমি উল্টে প্রশ্ন করলাম, তুমি আবার কে?

পাখি বললে, আমি শঙ্খচিল।

আমি সগর্বে বললাম, আমি মাটির মানুষ!

আমার কথা শুনে পাখিটা সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—চোর,

এক সময় আমিও ওদের মত আকাশে উড়তে লাগলাম

জোচ্চোর, আমাদের পাখা চুরি করেছে। ওকে ধরো, পালাতে দিও না।

সঙ্গে সঙ্গে অনেক শঙ্খচিল এসে আমাকে ঘিরে ধরল। সবাই মিলে ঠোকরাতে লাগল। ঠুকরে ঠুকরে আমার সব পালক বের

করে নিল। আমি আকাশ থেকে হু হু করে পড়তে লাগলাম। ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। ধড়মড় করে জেগে দেখি—না, কিচ্ছু নয়, আমি নিজের বিছানাতেই শুয়ে আছি।

বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ

তারপর মংশুর সঙ্গে অনেকদিন আর দেখা হয়নি। কয়েক মাস হবে। মংশুর সেই বিরাট পরিকল্পনার কথা আমি তো প্রায় ভুলেই যাচ্ছিলাম। এমন অবস্থায় হঠাৎ একদিন ঠিক ধূমকেতুর মতই মংশু এসে হাজির হল। কোন ভূমিকা না করেই আমার হাতে একতাড়া কাগজ গুঁজে দিয়ে বললে—এই কাগজগুলো খুব সাবধানে যত্ন করে রেখে দিবি।

কাগজগুলো উল্টে পাল্টে দেখলাম। নানারকম পাখির ডানার নকশা, কোনটাতে আবার লাল নীল পেন্সিল দিয়ে নিশান চিহ্ন দেওয়া আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, তুই শঙ্খচিলের দেখা পেয়েছিলি?

মংশু বলে উঠল, ওসব কথা এখন থাক। নো টক।

—কিরে এত বড় পরিকল্পনা, বন্ধ করে দিলি নাকি?

—না, বন্ধ করব কেন! আসলে এটা আপাততঃ মুলতুবি রইল। আর একটা বিরাট সুযোগ এসে গেছে। একটা বিরাট ব্যাপারে হাত দেব ভাবছি। আর সেই জন্যই তো তোর সঙ্গে পরামর্শ করতে এলাম। খুব ভেবে-চিন্তে একটা সৎ পরামর্শ দেতো।

মংশুর চোখে মুখে উৎসাহ। ওকে দেখে আমার খুব ভাল লাগল। সেই ডিরেক্ট অ্যাকশনের মংশু। আমাদের পুরোনো দিনের লীডার মংশু।

আমি তাড়াতাড়ি ইজি চেয়ারটা ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে বললাম—নে, ভাল করে আরাম করে বোস, তারপর তোর বিরাট ব্যাপারের কথা বল, মনোযোগ দিয়ে শুনি। কিন্তু তার আগে কিছু জলযোগ করে নেওয়া যাক।

মংশু একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললে, জলযোগ তো পরেও হতে পারে। আমার কথাটা ভয়ানক ইমপরট্যাণ্ট। সেটা আগে শুনে নে।

আমাদের হরিহর খুব কাজের লোক। সে ইতিমধ্যে এক পট চা এবং এক প্লেট ডিমটোস্ট টেবিলের ওপর রেখে গেছে। তা দেখিয়ে মংশুকে বললাম, এটাও ইমপরট্যাণ্ট।

একটা ডিমটোস্ট তুলে নিয়ে মংশু বললে, তুই দেখছি আগের মত ভোজনানন্দই রয়ে গেছিস।

পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে বললাম, ভোজনে আনন্দ সকলেই পায়, আমার দোষ ধরলে চলবে কেন ?

এক ঢোক চা গিলে মংশু বললে—আহা, রাগ করছিস কেন ? আনন্দ আমরাও পাই ; একটা কথার কথা বলছিলাম।

বললাম, ওসব কথা এখন থাক। তুই তোর বিরাট ব্যাপারের কথাটা বল।

মংশু বেশ ভারিক্কি চালে বললে, কাজটা যেমন বিরাট তেমনি দায়িত্বপূর্ণ। তাই ভাবছি ···

বললাম, তোর চোখ মুখ দেখেই বুঝতে পারছি কাজটা পালকের মত হাল্কা হবে না।

মংশু বিরক্ত হয়ে বললে, আবার পালকের কথা কেন! ও প্রসঙ্গ এখন থাক। আসল কথাটা একটু ভাল করে শোন।

বললাম, তার আগে চাটা শেষ করে নে। তারপর ঠাণ্ডা হয়ে বসে আস্তে আস্তে বল, মনোযোগ দিয়ে শুনি।

মংশু নিঃশব্দে চায়ের পেয়ালা শেষ করে একটু নড়ে চড়ে বসল। তারপর তার ঝোলা থেকে একটা পাতলা মত বই বার করে আমার হাতে দিয়ে বললে, এই বইটা আগে ভাল করে দেখে নে।

আমি বইখানা হাতে নিলাম। ভাল করে দেখলাম। পাতলা বই, চল্লিশ-পঞ্চাশ পৃষ্ঠার মত হবে, গোলাপী রঙের কাগজের মলাট। বইখানার নাম বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। রিসিভার সংস্করণ। দাম এক টাকা।

উল্টে পাল্টে দেখে আমি বইখানা আবার মংশুর হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

মংশু বেশ গম্ভীরভাবে বললে, এই বইটা বিক্রী করবার দায়িত্ব নেব ভাবছি।

মংশুর কথা শুনে আমি অবাক হয়ে ওর মুখের পানে চেয়ে রইলাম।

মংশু বললে—কিরে, পারব না।

আমি খুব গম্ভীরভাবে বললাম, কাজটা তো বেশ বিরাট বলেই মনে হচ্ছে!

মংশু মনে মনে খুশি হয়ে বললে, তবে! আর সেই জন্যই তো

তোর সঙ্গে পরামর্শ করতে এলাম। আচ্ছা ঠিক করে বলতো কত বই বিক্রী হতে পারে?

বইখানা হাতে নিলাম, দেখলাম ভাল করে

না ভেবেই বললাম, দু-চার শো বই বোধহয় তুই সহজেই বিক্রী করতে পারবি।

—কি বললি ! মংশুর স্বর বেশ গরম।

তাই সংখ্যাটা একটু বাড়িয়ে বলতে হল, তা ভাল করে চেষ্টা করলে হাজারখানেক···

কথাটা মংশু শেষ করতে দিল না। চেঁচিয়ে উঠল, তুই একটা আস্ত গর্দভ ! এই বই প্রত্যেক বাড়ীতে একখানা করে থাকা দরকার আর তুই বলিস কিনা হাজারখানেক !

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললাম, না ভেবেই কথাটা বলে ফেলেছি। এখন মনে পড়ছে ছোট বেলায় আমিও এই বই পড়েছি। শুধু পড়িনি—দুখানা বই ছিঁড়েও ফেলেছি।

মংশু বেশ ভারিক্কি চালে বললে, তবে ! আর তুই বলিস কিনা, যাক্ গে সেকথা। এখন একটা হিসেব করা যাক কত ধানে কত চাল হয়। তুই স্ট্যাটিসটিক্স সম্বন্ধে কিছু জানিস ?

—স্ট্যাটিসটিক্স ! এ রকম একটা কথা শুনেছিলাম বটে। ওই যে, যা দিয়ে আমাদের নেতারা দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে, মিষ্টিমিষ্টি মিথ্যা কথা বলে আর আমাদের গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেয়। সেই কথা তো ?

—দূর বোকা পলিটিক্স-এর কথা বলছি না। স্ট্যাটিসটিক্স হল গণনা করবার একটা পদ্ধতি। প্রথমে পুরো সংখ্যাটাই গণনা করা হয়। তারপর তাকে নানা ভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রতিভাগে কত সংখ্যা তার হিসেব করা হয়। একে বলা হয় সংখ্যা-বিজ্ঞান। তা থাক, ওসব বিজ্ঞান-ফিজ্ঞানে কাজ নেই। আমরা একটা সোজাসুজি যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগের হিসেব করি।

বললাম, সেই ভাল হবে।

—আচ্ছা বলতো আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কত লোক বাস করে ?

—সঠিক বলতে পারব না, তবে মনে হয় পাঁচ কোটির কম হবে না। তু-চার লাখ বেশীও হতে পারে।

—আমারও তাই মনে হয়। তাহলে ধরে নেয়া যাক আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ কোটি লোক বাস করে।

—ধরে নিলাম।

—লোকেরা তো একা একা থাকে না। মা, বাবা, ভাই-বোন নিয়ে এক-একটা পরিবার। আচ্ছা বলতো কত জন লোক নিয়ে এক-একটা পরিবার হতে পারে ?

—পরিবার ছোটও আছে বড়ও আছে। তবে পাঁচ ছ-জনের কম বোধহয় হবে না। তু-চার জন বেশীও কোন কোন পরিবারে থাকতে পারে।

—তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি প্রতি দশজন লোক নিয়ে এক একটা পরিবার হয়।

—সেটা ঠিক হবে না। সব পরিবারেই দশজন করে লোক কেন হবে। ছোট পরিবারের সংখ্যাই তো সব চেয়ে বেশী।

—একটু বেশী বেশী করেই ধরা যাক না। আপত্তি কিসের !

—না, সেরকম কোন আপত্তি নেই।

—তাহলে পাওয়া গেল পাঁচ কোটি লোক এবং দশ জন লোক নিয়ে এক-একটা পরিবার। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে মোট পঞ্চাশ লক্ষ পরিবার বাস করে। ঠিক তো !

মনে মনে হিসেব করে বললাম, ঠিক বলেই তো মনে হচ্ছে।

—প্রত্যেক পরিবারেই দু-চারজন ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে থাকতে পারে যারা অ আ ক খ শিখবে।

আমি মনে মনে হিসেব করতে লাগলাম—সব বাড়ীতেই ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে থাকে কি-না। আমাদের বাড়ীতে তো এখন ছোট আর কেউ নেই।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মংশু বললে, এতে যদি তোর আপত্তি থাকে, তাহলে প্রত্যেক বাড়ীতে অন্তত আধখানা শিশু আছে তা মেনে নিতেই হবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আধখানা শিশু!

মংশু হেসে বললে, এও একরকম হিসেবের কায়দা। ধর একটা বাড়ীতে একটাও শিশু নেই, আর অন্য একটা বাড়ীতে একটি শিশু আছে। তাহলে আমরা পাচ্ছি দুটো বাড়ীতে একজন শিশু। তাহলে সরল অংকের হিসেবে প্রত্যেক বাড়ীতে আধজন শিশু আছে।

—ও বুঝেছি। একেই তো বলে অ্যাভারেজ।

—ঠিক বলেছিস। এই অ্যাভারেজ কষলে দেখা যাবে আমাদের দেশে অন্তত পঁচিশ লক্ষ শিশু আছে যারা অ আ ক খ শিখবে। আমার হিসেবে কোন ভুল পাচ্ছিস?

—না, হিসেবটা তো জলের মতো পরিষ্কার। ভুল হবে কেন!

—তাহলে এই পঁচিশ লক্ষ শিশুর জন্য অন্তত পঁচিশ লক্ষ বই-এর প্রয়োজন হবে।

—তাতো হবে।

—আর পঁচিশ লক্ষ বই-এর যখন প্রয়োজন তখন পঁচিশ লক্ষ বইও বিক্রী হবে। তুই কি বলিস?

মংশুর কথা শুনে আমি নিজেই চমৎকৃত হলাম। কি বিরাট বাজার আর কি বিরাট সম্ভাবনা। আমি ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম। এখন দেখছি ঠাট্টা করবার মত ব্যাপার এটা নয়। বললাম, তোর যুক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য এবং নিঃসন্দেহে মেনে নেওয়া যায়।

—আর ওরা বলেছে প্রতিটি বই-এর জন্য ওরা আমাকে পঁচিশ পয়সা করে কমিশন দেবে।

আমি বলে উঠলাম, বলিস কিরে! একেবারে টুয়েন্টি-ফাইভ পার সেণ্ট!

—তবে! বলে মংশু বেশ গর্ব সহকারে আমার মুখের দিকে তাকাল।

তারপর একটু দম নিয়ে বললে, এখন তাহলে একটা হিসেব করা যাক। প্রতি বইতে পঁচিশ পয়সা, অতএব চারখানা বইতে এক টাকা।

বললাম, ঠিক। করেক্ট।

—এবার তাহলে ভাল করে হিসেব করা যাক। একটা কাগজ নে। প্রথমে লেখ বই। একটা দাঁড়ি দে। তারপর লেখ চার, সংখ্যায়। তার নীচে লেখ টাকা আর এক লাইনে, একটা দাঁড়ি দে। তারপর লেখ এক, সংখ্যায়। লিখেছিস!

আমি একখানা কাগজ নিয়ে মংশুর নির্দেশ মত সব লিখলাম এবং মংশুকে দেখালেম।

মংশু বললে, ঠিক হয়েছে। এবার আমি বলে যাব, তুই শুধু ওপরে আর নীচে একটা করে শূন্য দিয়ে যাবি।

আমি পেনসিল হাতে করে রেডী হয়ে রইলাম।

মংশু বললে, চল্লিশখানা বই, ওপরে একটা শূন্য দে ; দশ টাকা, নীচেও একটা শূন্য দে।

ওপরে নীচে একটা করে শূন্য দিলাম।

—চারশো বই, একশো টাকা।

আবার একটা করে শূন্য বসালাম।

—চার হাজার বই, এক হাজার টাকা।

আবার একটা করে শূন্য দিলাম।

—চল্লিশ হাজার বই, দশ হাজার টাকা।

আবার একটা করে শূন্য বসল।

—চার লাখ বই ··· ···থাক আর হিসেব করবার দরকার নেই। আমার হিসেবে কোন ভুল পেলি ?

—এতো পরিষ্কার হিসেব। জলের মত সোজা।

—তাহলে কাজটা কি নেয়া যায়! ভাল করে ভেবে-চিন্তে বলবি।

—নেয়া যায় কিরে! নিশ্চয়ই নিবি।

আমার উৎসাহ দেখে মংশু একটু যেন দমে গেল। তাই দেখে বললাম, আবার ভাবছিস কি ?

—কিছু ভাবছি না। মনটা একটু চঞ্চল হয়ে আছে। তাই তাকে সংযত করবার চেষ্টা করছি।

—হ্যাঁ, একটা বেশ শক্ত মন নিয়ে অগ্রসর হওয়া দরকার। তবে এ ব্যাপারে দেরী করা মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না। জ্ঞানী লোকের কথা হল—শুভস্য শীঘ্রম্ !

মংশু হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললে, ঠিক বলেছিস! শুভস্য শীঘ্রম্। তাহলে কাজটা নিলাম।

আমি আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে বলে উঠলাম, সাবাস! এই তো চাই।

—তাহলে আজ থেকে আরম্ভ করি আর এখন থেকেই আরম্ভ করি। তোকে দিয়েই তাহলে বউনি করি।

এই বলে মংশু তার ঝোলার ভেতর থেকে একখানা বই বার করে আমার হাতে ধরিয়ে দিল।

ওর উৎসাহে যাতে ভাটা না পড়ে আমিও তাই তখনি পকেট থেকে টাকা বার করলাম। আমার কাছে এক টাকার নোট ছিল না, তাই একটা হুটাকার নোট মংশুর হাতে দিলাম।

ওর কাছেও খুচরো টাকা ছিল না। তাই একটু ইতস্তত করে বললে, খুচরো টাকাতো সঙ্গে নেই, তুই তাহলে হুখানা বই-ই রাখ।

মংশু আর একখানা বই আমার হাতে দিল। দিয়েই পা বাড়াল যাবার জন্য।

ওর যাত্রাকে শুভ করবার জন্য বললাম, জয় যাত্রায় যাও হে বীর!

বীরের মতই দৃঢ় পদক্ষেপে মংশু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি বই হুখানা হাতে নিয়ে বসে রইলাম। নানা রকম চিন্তা, নানা রকম ভাবনা মনের ভেতর ভীড় করতে লাগল। লাখ টাকা মংশুর পিছন ছাড়েনি, মংশুও ছাড়েনি। মনে হল আসল কথা হয়ত তা নয়। কারণ মংশু নিজেই লক্ষপতি। শুধু বন্ধু বিহনে নিজেকে একা অসহায় মনে করে। তাই এই অশান্ত মনকে কোন কাজে

নিযুক্ত রেখে ভুলে থাকতে চায়। ওর জন্য দুঃখ হয়। চিন্তাও হয়।

আবার অবাক হয়ে ভাবলাম আমরা হিসেব করে যে বাজারের সন্ধান পেলাম তা যেমন বিরাট তেমনি বিপুল তার সম্ভাবনা। এই বিরাট বাজারে দু-চার হাজার না হোক দু-চারশো টাকা রোজগার করা অসম্ভব বলে মনে হয় না। কিন্তু আমরা কি করছি। লেখা-পড়া শিখে চাকরীর দরখাস্ত পকেটে নিয়ে অফিস পাড়ায় ঘুরে মরছি আর সকাল-সন্ধ্যা কোন মন্দিরে গিয়ে দেব-দেবীর পায়ে মাথা কুটছি।

এই আমাদের দেশ!

মংশুর বৈরাগ্য

অনেক দিন পরে।

পর্দাটা সরিয়ে মংশু ঘরে ঢুকল। আমি চেঁচিয়ে বলতে যাচ্ছিলাম—কিরে, তোর লাখ টাকার কত হাজার হল, কিন্তু ওর শুকনো বিষণ্ন মুখ দেখে কোন কথাই বলতে পারলাম না।

মংশু সোজা ইজি চেয়ারটায় গিয়ে অবশ হয়ে বসে পড়ল। অস্ফুট স্বরে কোন রকমে বললে, জল!

আমি তাড়াতাড়ি এক গেলাস জল গড়িয়ে দিলাম। তারপর আর এক গেলাস দিলাম।

মংশু ঢক ঢক করে দু-গেলাস জল নিঃশেষ করল।

বললাম, তোকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে! কি হয়েছে?

মংশু সোজা ইজি চেয়ারটায় গিয়ে অবশ হয়ে বসে পড়ল,
কোন রকমে বললে, জল

—আর বলিস না, একেবারে হয়রাণ হয়ে গেলাম।

—তোকে দেখে তাই মনে হচ্ছে। তুই বেশ রোগাও হয়ে গেছিস।

—এর জন্য আমায় তোমরা দোষ দিতে পারবে না। আমার মত সকাল থেকে সন্ধ্যা আর দিনের পর দিন যদি তোদের টো-টো করে ঘুরে বেড়াতে হত তাহলে তোদেরও এই রকম অবস্থা হত।

মংশুর কথা শুনে একটু হেসে বললাম, কিন্তু এর জন্য নিশ্চয়ই তোর শরীর খারাপ হতে পারে না। কারণ তুই তো এককালে আমাদের টো-টো কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলি।

আমার কথা শুনে মংশুর মুখে মিষ্টি একখানি হাসি ফুটে উঠল।

একটা শুকনো, ফ্যাকাশে বিষণ্ন মুখে একটা মিষ্টি হাসি তোমরা কি কেউ দেখেছো! এ হাসি দেখবার মত এবং মনে রাখবার মত।

মংশুর মুখে হাসি দেখে আমি বললাম, তোর এই ডিমফল হাসিটা এখনো বজায় আছে দেখছি। তুই বোধহয় জানিস না, তোর এই হাসিটার দামই লাখ টাকা।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে মংশু বললে, সে সব দিন কি আর আছে! সব কি রকম বদলে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে।

বললাম, হ্যাঁ সত্যি! অনেক বদলে গেছে এবং সবই বদলে যাচ্ছে। আমরাও বোধহয় বদলে যাচ্ছি।

মংশু বললে, এরই নাম জীবন! আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। আর কিছুই ভাল লাগছে না। এবার একদিন সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাব।

বলে উঠলাম, সে কিরে! তাহলে এই বর্ণ-পরিচয়ের কি হবে!

আর সেই লাখ টাকার হিসেবটাই বা কোথায় যাবে !

মংশু উদাসীনভাবে বললে, ওরা কোথাও যাবে না। কাগজের হিসেব কাগজেই থাকবে।

—তার মানে তুই এসব ছেড়ে দিচ্ছিস।

—না, ঠিক ছাড়ছি না। তবে ভাবছি। আসলে আমাদের হিসেবে একটা মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল।

আমি আপত্তি করে বললাম, আমাদের হিসেবে ভুল ! না, তা হতে পারে না। আমরা সবই খুব কম কম করে ধরেছিলাম, খুব সাবধানে হিসেব করেছিলাম। ভুল হতেই পারে না।

—না, অংকের হিসেবে কোন ভুল ছিল না। আসল ভুলটা ছিল একেবারে গোড়ায়। যাকে বলে গোড়ায় গলদ।

—গোড়ায় গলদ ? তার মানে ?

মংশু তার মুখটা আমার কানের কাছে এনে ফিসফিস করে বললে, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে একটাও বাঙালী নেই।

ওর কথা শুনে আমি মহা-বিস্ময়ে বলে উঠলাম, কী যা-তা বলছিস। তোরই মাথা খারাপ হয়েছে।

—আমি ঠিকই বলছি।

—না, তোর এ কথা আমি মানতে পারব না। কে তোর মাথায় এসব আজগুবি ধারণা ঢুকিয়েছে জানি না। তবে তোর এ ধারণাটা খুবই ভুল।

—আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। এই একখানা বই যা প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে ঘরে থাকা উচিত, সেই বই তাহলে বিক্রী হয় না কেন !

—সে কিরে ! তুই বই বিক্রী করতে পারিসনি ! আমি তো ভেবেছিলাম এত দিনে দু-চার হাজার বই বিক্রী করে ফেলেছিস।

—দু-চার হাজার না হাতি। এতদিন ঘোরাঘুরির ফল হল সর্বমোট তিনখানা বই বিক্রী।

আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, কোথায় কোথায় গিয়েছিলি শুনি।

—কোথায় যায়নি তাই বল। এই বই নিয়ে আমি সর্বত্র ঘুরেছি। প্রথমে তুই নিলি দুখানা, তারপর পিসিকে দিলাম একখানা, তার দামটা এখনো পাইনি। তারপর আমার পরিচিত যত ছেলে ছিল, সেই ডিরেক্ট অ্যাকশনের প্রসেশনের সময় আমরা তো তিরিশ-পঁয়তিরিশজন ছিলাম মনে আছে ? তারা তো এখন বেশ ভালো ভালো কাজ করছে, তাদের প্রত্যেকের কাছে গেলাম। তারা বেশ খাতির করে বসালো, অনেক গল্প করল, চায়ের সঙ্গে টা-ও খাওয়াল, আমাকে অনেক উৎসাহ দিল কিন্তু একখানা বইও কিনল না।

বললাম, তুই বড় বোকার মত কাজ করেছিস। ওদের বাড়ীতে কি ছোট ছেলেমেয়ে আছে যে এই বই কিনবে ! তোর উচিত ছিল সেইসব লোকের কাছে যাওয়া যাদের বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়ে আছে। তা না করে তুই···

আমাকে বাধা দিয়ে মংশু বললে, তুই তো এখন বোকার মত কথা বলছিস। আমি কি ওদের চিনি, না জানি যে ওদের কাছে যাব। তাই ঠিক করলাম প্রথমে চেনা লোকদের কাছে যাই, তারপর আস্তে আস্তে অচেনা লোকদের কাছে যাব। এমনি করেই

কাজের পরিধি বাড়িয়ে নেব। তা চেনা লোকরাই আমাকে ডুবিয়ে দিল, অচেনারা আর কি করবে।

বললাম, এতক্ষণে তোর অবস্থাটা বুঝতে পারলাম (তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না এই কথাটা আর বললাম না।) তা, এখন তুই কি করবি ঠিক করেছিস ?

—দুঃখের কথা আর বলিস না। এ জগতে কেউ কারো নয়। আকাশের পাখিগুনো পর্যন্ত আমাকে ডুবিয়ে দিল। কত খুঁজলাম, সমুদ্রের তীর পর্যন্ত গিয়েছিলাম। একটা শঙ্খচিলও দেখতে পেলাম না। আমার আর করবার কিছুই নেই। এখন সব ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বনে চলে যাওয়াই ভাল।

ও মনমরা হয়ে বসে রইল।

বুঝতে পারলাম ও বেশ দমে গেছে। কোথাও হয়ত মানসিক একটা ধাক্কা খেয়েছে। কিন্তু ওকে তো আমি জানি। মনমরা হয়ে বেশীক্ষণ বসে থাকার ছেলে ও নয়। ও নিজে নিজেই সামলে উঠতে পারবে। তবু ওকে একটু আশ্বস্ত করবার জন্য বললাম, তুই একটুতেই ঘাবড়ে যাস। কী আর এমন হয়েছে! তা ও নিয়ে মন খারাপ করিস না। তুই আজ এবেলা আমার এখানেই থেকে যা। অনেক আলোচনা করা যাবে। দুপুরে আমার সঙ্গেই খাবি। আজ ছুটির দিন কিনা, তাই একটু বিশেষ আয়োজনও হয়েছে। চিংড়ি মাছ দিয়ে চাইনিজ নুডুল সেই সঙ্গে ফ্রায়েড চিকেন। আরো অনেক কিছু আছে। খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করে বিকেলের দিকে যাবি।

কথায় কাজ হল। ওর মুখে সেই ডিমফল হাসি ফুটে উঠল।

এবং বেশ অন্তরঙ্গভাবেই বললে, তোর মত একজন বন্ধু আছে বলেই পৃথিবীটা আজো রসাতলে যায়নি। কিন্তু তুই একা কত আর সামলাতে পারবি।

খেতে বসে আমরা নানা রকম বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। আমাদের স্কুলের কথা, ছোটবেলার সেই দিনগুলির কথা। কেমন করে আমরা স্কুল পালাতাম আর নদীর ধারে বসে সমুদ্রগামী জাহাজ দেখতাম। কেমন করে রায়বাবুদের পেয়ারা বাগানে ডাকাতি করেছিলাম। কেমন করে পিকনিকের আয়োজন করতাম। আরো অনেক কথা।

খেতে খেতে মংশু আমাদের ঠাকুরের রান্নার খুব প্রশংসা করল। বললে, লোকটা বেশ রাঁধে।

আমি বলে উঠলাম, কেন মংশু আমাদের পিকনিকে তুইও তো বেশ ভাল রাঁধতে পারতি।

মংশু বিষাদের হাসি হেসে বললে, সেসব দিন কোথায় চলে গেছে। তখন আমরা কেমন সহজ স্বচ্ছন্দে ছিলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর মংশু দেখতে দেখতে বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। ওর মনমরা ভাবটা আস্তে আস্তে কেটে গেল। ইজি চেয়ারটায় আরাম করে বসে কিছু হালকা আলোচনাও শুরু করল। দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে এ বিষয়ে ওর মনে আর কোন সন্দেহ নেই। আমি বসে বসে ওর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম।

কথায় কথায় বেশ সহজভাবেই মংশু বললে, জানিস বুদ্ধু, আমি মন স্থির করে ফেলেছি। এবার সত্যি সত্যি একদিন আমি সব ছেড়ে ছুড়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাব।

আমিও তেমনি সহজভাবে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাবি, উত্তরে হিমালয়ে না দক্ষিণে কন্যাকুমারীতে ?

—না, বিশেষ কোথাও যাচ্ছি না।

—তবুও কোথাও না কোথাও তো যাবি!

—কোথাও যাব না। সাধু হয়ে এই কলকাতা শহরেই থাকবো।

—সেটা মন্দ হবে না। আমরা তাহলে তোর চেলা হতে পারব।

—ঠিক বলেছিস। আমার মাথায় একটা গ্র্যাণ্ড প্ল্যান আসছে। তোকে একটু বুঝিয়েই বলি। ভাল করে শোন।

এই বলে মংশু একটু দম নিল। তারপর বলতে লাগল, এই কলকাতা শহরেই তুই হয়ত দেখতে পাবি কোন রাস্তার ধারে একটা সাধুমত লোক একটা দেব-দেবীর ছবি টাঙিয়ে বসে আছে। তার পরনে একটা ময়লা গেরুয়া লুঙ্গি, সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখা, কপালে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা তিলক। ছবিটার সামনে একখানা পূজার থালা। থালার ওপর কিছু ফুল, বেলপাতা আর কিছু খুচরো পয়সাও আছে। তুই কি এ-রকম কাউকে কোনদিন দেখেছিস ?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি। প্রায় রোজই তো এ-রকম দৃশ্য নজরে আসে।

—একদিন হয়ত দেখবি কোন রাস্তার ধারে আমিও ওই রকম সাধু সেজে বসে আছি।

—সত্যি! তাহলে তো গ্র্যাণ্ড একটা অ্যাডভেঞ্চার হবে। আর তোরও অনেক নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হবে।

—শুধু অভিজ্ঞতা নয়, আরো অনেক কিছু হবে।

—অনেক কিছু মানে তো তোর পূজার থালায় কিছু টাকা-পয়সা জমবে।

—শুধু টাকা-পয়সা নয়। সেই সঙ্গে নাম হবে, অনেক ভক্ত জুটবে, অনেকে আমাকে সাক্ষাৎ ভগবানের মত পূজা করবে এবং আরো অনেক মজার মজার ঘটনা ঘটবে। কেমন করে কি হবে আমি সব প্ল্যান করে ফেলেছি। তোকে বলছি শোন।

আমি কি করব জানিস! ওই সব থার্ডক্লাশ সাধুর মত আমি হব না। গেরুয়া অবশ্য পরব তবে আমারটা হবে সিল্কের গেরুয়া। ভস্মও গায়ে মাখব তবে তা হবে ছাই রঙের সুগন্ধি পাউডার। আর দেয়ালে যে ছবিটা টাঙাব তা দেখতে এমন কিম্ভূত-কিমাকার হবে যে দেখলেই ভয় এবং ভক্তি এক সঙ্গে মনে জাগবে। আর ছবিটার নীচে বড় বড় দেবনাগরী অক্ষরে গীতার এই শ্লোকটা লেখা থাকবে ঃ

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদা সৃজম্যহম্॥

—তুই গীতা পড়েছিস?

মাথা চুলকে বললাম, ঠিক মনে পড়ছে না।

—পড়ে দেখিস। ওর ভেতর অনেক জ্ঞানের কথা আছে। আর এই শ্লোকটার মানে জেনে রাখ ঃ পৃথিবীটা যখন রসাতলে যাচ্ছে, চুরি-জোচ্চুরি আর অন্যায়ে ভরে উঠেছে সেই সময় এদের ঠাণ্ডা করবার জন্য ডাণ্ডা হাতে একজন অবতারের আবির্ভাব প্রয়োজন। আমিই সেই অবতার।

আমি হাততালি দিয়ে বলে উঠলাম, বাঃ কী গ্র্যাণ্ড! তুই তাহলে একজন অবতার হয়ে যাবি!

মংশুর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। বললে, কেন হব না। গ্র্যাণ্ড স্টাইলে বসে থাকব আর আমার কাছে আমি এক পাত্র বিভূতি রেখে দেব।

—বিভূতি? সে আবার কি?

—বিভূতি হল পবিত্র ভস্ম। এর অলৌকিক শক্তি আছে। স্পর্শ করলেও পুণ্য হয়। আসলে এটা হল রান্নাঘরের উনুনের ঘুঁটে পোড়ানো ছাই। দেবভাষায় একেই বলে বিভূতি।

—তা, এ দিয়ে কি হবে।

—হয়ত কিছুই হবে না, ভড়ং তো রাখতে হয়। আবার হলে অনেক কিছু হতে পারে। আমার কাছে কিছু লোকতো আসবেই। তাদের প্রত্যেকের হাতে এক পুরিয়া বিভূতি দিয়ে দেব এবং দেব-ভাষায় বলব, জেব মে রাখ দে বেটা, কাম দেগা। প্রথম প্রথম হয়ত কেউ এই বিভূতির শক্তি টের পাবে না, তবে মাঝে মাঝে লেগে যেতে পারে। যারা সাধু-সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদের জন্য ঘোরা-ঘুরি করে তাদের অনেকেই চাকরীর জন্য পাঁচ-সাত জায়গায় দরখাস্ত করে রেখেছে। এখন এমনও হতে পারে যে, যে ছেলেটি আমার কাছ থেকে বিভূতি নিয়ে গেল সেইদিনই সে বাড়ী গিয়ে দেখল যে তার নামে চিঠি এসেছে, ইণ্টারভিউর ডাক পড়েছে। এই ছেলেটির মনের অবস্থা তখন কি রকম হবে একবার ভাবতো! আর চাকরীটা যদি সে পেয়ে যায় তাহলে তো সে আমার ভক্ত-গোলাম হয়ে থাকবে। এমনি করে ভক্তের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। এবং ওরাই চারদিকে আমার জয় জয়কার করে বেড়াবে। আর বুঝতেই পারছিস আমার থালায় অজস্র টাকা-পয়সা পড়তে থাকবে।

একদিন আমি এক ক্যাডাভেরাস সাধুকে দেখেছিলাম। নোংরা, কালো, দেখলেই ঘেন্না হয়। কিন্তু তার থালায় পয়সার পর পয়সা জমতে লাগল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে হিসেব করে দেখলাম পনের-কুড়ি টাকার কম হবে না। আচ্ছা বলতো আমার থালায় রোজ কত পয়সা জমা হতে পারে ?

বললাম, তুই যদি মানুষের অন্ধবিশ্বাস এইভাবে খেলাতে পারিস তাহলে বিশ-পঁচিশ টাকা রোজই তোর থালায় পড়বে, বেশীও হতে পারে।

—বেশীটা হিসেব করবার দরকার নেই। একটু কম করে ধরাই ভাল। তাহলে ধর, আমার থালায় রোজ অন্তত দশ টাকা করে জমছে।

—তা তো জমবেই। এতে কোন সন্দেহ নেই।

—ঠিক বলেছিস, কোন সন্দেহ নেই। তাহলে এবার একটা হিসেব করা যাক।

এতক্ষণে ওর আসল প্ল্যানটার আন্দাজ পেলাম। বললাম, কিসের হিসেব।

—বলছি। একটা কাগজ নে। প্রথম লাইনে লেখ দিনের হিসেব। নীচের লাইনে লেখ টাকার হিসেব।

কাগজ ও পেন্সিল নিয়ে বললাম, ওঃ তোর সেই শূন্যের খেলা আবার শুরু হল।

—এই দুনিয়াটাইতো শূন্যের খেলা। অখণ্ড মণ্ডলাকার। তারপর এক মহাশূন্যে সব বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে আমরা আমাদের হিসেবটা তৈরি করে রাখি। নে, দিনের লাইনে লেখ এক এবং টাকার লাইনে লেখ দশ।

তাই লিখলাম।

মংশু বলে চললো, দশ দিন, একশো টাকা—

কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বললাম, ও তোর সেই শূন্যের খেলা আবার শুরু হল

আমি একটা করে শূন্য দুই লাইনেই দিলাম।

—একশো দিন, এক হাজার টাকা।

আবার একটা করে শূন্য বসলো।

—এক হাজার দিন, দশ হাজার টাকা।

আবার একটা করে শূন্য।

—দশ হাজার দিন··· থাক আর হিসেবের দরকার হবে না।

আমি বলে উঠলাম, আবার তো তুই সেই লাখে পৌঁচে গেলি।

একটা প্রশান্ত হাসি হেসে মংশু বললে, আমার হিসেবে ভুল ধরতে তোমরা পারবে না। হিসেবে আমি বৃহস্পতি। শুধু স্কুল ফাইনালটা পাশ করতে পারলাম না এই যা দুঃখ।

মংশু উঠে পড়ল। বললে, তোর এখানে দিনটা বেশ আনন্দেই কাটলো। একটা কথা মনে করিয়ে দি। আমি সাধু হয়ে বসলে মাঝে মাঝে যাবি আর খুব ভক্তিভরে প্রণাম করবি। আমাকে নয়, ছবিটাকে। আর থালায় দশটা কি পঁচিশটা পয়সা ফেলে দিবি। সে পয়সা আমি আবার ফেরত দিয়ে দেব। দেবুকে ও শিবুকেও বলবি। প্রথম প্রথম এ সব করতে হয়। বুঝলি! আজ তাহলে চলি, এই বলে মংশু শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেল।

মংশু চলে গেলে বসে বসে ভাবছিলাম। লাখ টাকা ওর পেছন ছাড়েনি, ও-ও লাখ টাকার পেছন ছাড়েনি। তবে এবার দিনের হিসেব, আর দিন তো দেখতে দেখতে কেটে যায়। সকালে আরম্ভ সন্ধ্যায় শেষ। হঠাৎ খেয়াল হল দিন হলে কি হবে, দশ হাজার দিন। চাটটিখানি কথা নয়। তখনি কাগজ-পেন্সিল নিয়ে হিসেব করতে বসলাম, দশ হাজার দিনে কত বছর, কত মাস, কত দিন হয়।

দুঃসংবাদই বটে

যাদবপুর থেকে দেবু বোধহয় এক দৌড়ে এসে গেল। বেশ হাঁপাচ্ছিল। ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করল, তুই শুনেছিস ?

আমিও উল্টে ওকে প্রশ্ন করলাম, তুই শুনেছিস !

তারপর আমরা দুজনেই খুব হাসতে লাগলাম।

নীলরতন থেকে শিবুও এসে গেল। ও এখন ডাক্তার হয়ে গেছে। ওর মুখেও সেই একই প্রশ্ন, তোরা শুনেছিস !

আমরা তিনজনেই খুব হাসাহাসি করতে লাগলাম।

আমাদের এই আনন্দ-উল্লাসের কারণ হল মংশু স্কুল ফাইনাল পাশ করে ফেলেছে। খবরটা কিন্তু মংশু আমাদের জানায়নি। আমরা জানতে পারলাম খবরের কাগজ থেকে।

সবরকম পরীক্ষার ফল সাধারণত খবরের কাগজে প্রকাশ করা হয়। খবর হিসেবে এর গুরুত্ব আছে বলে কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাতেই খবরটা দেওয়া হয়। তবে বিশেষ কোন খবর থাকে না। যা থাকে তাহলো মোট কত ছেলে পাশ করল, পাশের পারসেনটেজ কত, ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা কত, প্রথম ডিভিশন এবং অন্যান্য ডিভিশন কত, এই সব। প্রথম দশজন ছেলের নামও অনেক সময় ছাপা হয়। মংশুর নাম অবশ্য প্রথম দশজনের ভেতর পাবার কথা নয়। তবে আমরা প্রথম পাতাতেই মংশুর নাম পেলাম একটা বক্সের ভেতর।

কোন বিশেষ খবর সহজেই যাতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে সেইজন্য সেই খবরটার চারপাশে বর্ডার দিয়ে ঘিরে দেওয়া

হয়। খবরের কাগজের ভাষায় একেই বলা হয় বক্স। মংশুর খবরটা এইরকম ভাবে বের হয়েছিল ঃ

অধ্যবসায়

হরিদাসপুর হাইস্কুলের শ্রীমান হিমাংশু চৌধুরীর অধ্যবসায়ের পরিচয় সম্প্রতি পাওয়া গেল। তিনি অষ্টমবারের চেষ্টায় এবার পাশ ডিভিশনে সেকেণ্ডারী বোর্ডের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মংশুর জন্য আমি খুব চিন্তিত ছিলাম। তার সঙ্গে বহুদিন দেখা হয়নি। সেই যে সাধু হয়ে দশ হাজার দিনে একলাখ টাকা সংগ্রহ করবার পরিকল্পনা নিয়ে হাল্কা মনে শিস দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তারপর আর দেখা হয়নি। তারপর ওর পিসি হঠাৎ মারা গেলেন, সে দুঃখের কাহিনীটা আগে বলিনি, তারপর ও কেমন যেন উদাসীন হয়ে গিয়েছিল। আমি তো মাঝে মাঝে বাড়ী যেতাম, বাড়ী গিয়েই মংশুর খোঁজ করতাম। ওকে কখনও পেতাম না। তাই আমার খুব সন্দেহ হয়েছিল শেষকালে কি সন্ন্যাসীই হয়ে গেল নাকি! একদিন পথে পথে ওর খোঁজেও বেরিয়েছিলাম এবং একটা নাদুস নুদুস সাধুকে দেখে মংশু ভেবে দশটা পয়সাও দিয়ে ফেলেছিলাম। ওর পাশের খবরটা শুনে পরম নিশ্চিন্ত হতে পারলাম।

শিবু বললে, এখন কি করা যায়!

দেবু বললে, ওকে গিয়ে পাকড়াও করতে হবে।

আমি বললাম, আমিও তাই ভাবছিলাম।

আমরা তখনি আমাদের প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেললাম। গ্রামে যেতে হবে এবং এক্ষুণি যেতে হবে।

কলকাতা থেকে হরিদাসপুর খুব বেশী দূর নয়। ট্রেনে ঘণ্টাখানেকের পথ। আজকাল বাসেও যাওয়া যায়। আমরা ট্রেন ধরলাম।

গাড়ীতে বসে আমি বললাম, অধ্যবসায় কাকে বলে মংশু তা দেখিয়ে দিল।

শিবু বললে, আমি জানতাম ও প্রত্যেক বছর পরীক্ষা দিচ্ছে। আর ফেল করে ঘাবড়াবার মত ছেলে ও নয়।

দেবু বললে, আমার মনে হয় ওর পিসির অকস্মাৎ মৃত্যু ওকে বেশ সজাগ করে দিয়েছে।

আমি বললাম, ওর পিসি যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে খুব আনন্দ পেতেন।

শিবু বললে, ওকে নিয়ে এখন কি করা যায়, বলতো!

দেবু বললে, ওর রীতিমত বিচার হওয়া দরকার।

শিবু সায় দিয়ে বললে, আর জরুরী তথ্য গোপন রাখার জন্য ওকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে।

আমি বললাম, আর আরো অধ্যবসায় দেখাবার জন্য কঠোর নির্দেশ দেওয়া হবে।

আমরা তিন বিচারপতি একমত হয়ে গেলাম।

হরিদাসপুর নেমে আমরা সোজা মংশুর ওখানে চলে গেলাম।

মংশু বাড়ীর গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের দেখে এগিয়ে এল, হাসি মুখে বললে, তোরা আসবি আমি জানতাম।

আমি বললাম, এরকম একটা সংবাদ শুনে না এসে থাকা যায়!

দেবু বলে উঠল, আর তুই হতভাগা একটা খবরও দিলি না।

মংশু বোকাবোকা ভাব দেখিয়ে বললে, আমি কী খবর দেব রে! দুঃসংবাদ তো বাতাসের আগে ছোটে।

শিবু মংশুর পিঠ চাপড়ে বললে, ঠিক বলেছিস! দুঃসংবাদই বটে।

মংশু আমাদের নিয়ে ওদের বসবার ঘরে মানে বৈঠকখানায় গেল। এই ঘরটা আমাদের সুপরিচিত। এই ঘরে বসে আমরা অনেকদিন অনেক আড্ডা দিয়েছি। তখন ঘরটা খুব অগোছাল থাকতো। আসলে আমরাই অগোছাল করে দিতাম। এবার ঘরটাকে বেশ সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে দেখলাম। দুটো সোফা ঘরের দুদিকে, কয়েকটা ইজি চেয়ারও আছে। ফরাসটায় নতুন ফোমের গদি এসেছে, কয়েকটা ছোট-বড় টেবিলও আছে এদিক ওদিকে। বুক সেল্‌ফ, দেয়াল ঘড়ি, কয়েকটা ছবি আর আছে এক গামলা পদ্মফুল। মংশুর পিসি পদ্মফুল খুব ভাল-বাসতেন, এই জন্য ওদের বাগানে কয়েকটা স্থলপদ্মের গাছও লাগানো হয়েছিল।

আমরা ঘরে ঢুকে আরাম করে বসলাম এবং নানা-রকম আলোচনা শুরু করলাম।

মংশু চুপ করে শুনছিল। আমাদের আলোচনায় কোন অংশ

নেয়নি। হঠাৎ বলে উঠল, তোরা এইসব আবোল-তাবোল বকবি না, আমার একটা খুব ইমপরট্যাণ্ট কথা শুনবি ?

আমরা বললাম, আরে তোর কথা শুনবার জন্যই তো আমরা এসেছি।

মংশু বললে, খুব ইমপরট্যাণ্ট কিন্তু। অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনবি।

আমরা অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে চুপ করলাম।

মংশু গম্ভীরভাবে বললে, সবচেয়ে ইমপরট্যাণ্ট হল তোরা সকলে আজ আমার সঙ্গে এখানে ভোজন করবি।

মংশুর কথা শুনে আমরা একসঙ্গে হেসে উঠলাম। বললাম, তুই বলবার আগেই আমরা তা স্থির করে নিয়েছি।

ভোজন পর্বটা বেশ উপাদেয় হল। ওরা আমাকে বলতো ভোজনানন্দ। এখন দেখলাম ওরা সকলেই বেশ আনন্দ করে খেল।

খাবার পর বিশ্রাম নেয়াটা ভাল। আমরা তাই সুবিধা মত জায়গা করে নিলাম। শিবু ফরাসে শুয়ে নাক ডাকাতে লাগল। দেবু একটা ট্র্যানজিস্‌টার নিয়ে একটা স্টেশন ধরবার চেষ্টা করে চললো। আমি সোফার এক কিনারে বসে কয়েকখানা পুরোনো পত্রিকার পাতা ওলটাতে লাগলাম।

বিকেলের দিকে মংশুকে নিয়ে আমরা ঘুরতে বের হলাম।

মংশু বললে, আমাদের গ্রামে দেখবি অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

দেবু বললে, কিছু কিছু পরিবর্তন আমার নজরে পড়েছে। সব ভাল করে দেখতে হবে।

শিবু বললে, এই মংশুদের এখানেই তো কত পরিবর্তন দেখছি।

মংশু একটু হাসল।

আমরা একসঙ্গে রাস্তায় নামলাম।

আমাদের গ্রামে পাকা বাড়ী বিশেষ ছিল না। এখন অনেক বাড়ীই পাকা হয়ে উঠেছে, অনেক একতলা বাড়ী দোতলা হয়েছে। পায়ে চলা পথগুলি এখন খোয়া দিয়ে বেশ পাকা করা হয়েছে। আমাদের স্কুলে যাবার রাস্তাটা বেশ চওড়া করা হয়েছে। আগে সাইকেল রিক্সা গ্রামের ভেতর ঢুকতে পারত না। স্টেশনে যাবার বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত আসত। এখন গ্রামের অনেক জায়গায়ই সাইকেল রিক্সা যাতায়াত করতে পারে।

আমরা একটা মাঠের ভেতর দিয়ে পথ সংক্ষেপ করে স্কুলে যেতাম। সে মাঠটাকে আর চেনা যায় না। মাঠটার চারদিকে ছোট বড় নানা-রকম বাড়ী উঠেছে, এখনো উঠছে। মংশু বললে, বহু অবসরপ্রাপ্ত লোক এখানে জমি কিনে বাড়ী করছেন। আর কয়েক বছরে আমাদের গ্রামটা শহর হয়ে যাবে।

মংশু আরো খবর দিল যে, আমাদের গ্রামে শীগগিরই একটা সিনেমা হল হবে। কালু মুদী উদ্যোগী হয়ে টাকা ঢালছে। সে কালোবাজারী করে বহু টাকা করেছে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা নবীনবাবুর চায়ের দোকানের কাছে এসে গেলাম। এই দোকানে বসে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। আড্ডা দেবার একটা ভাল জায়গা ছিল এই দোকানটা। দোকানটা এখন আর সেরকম ছোট খুপরি নয়। বেশ বড় হয়েছে। এখন চায়ের সঙ্গে চপ-কাটলেট, ডিম-ডেভিলও পাওয়া যায়। নবীনবাবু আমাদের চিনলেন, বেশ খাতির করে দোকানে বসালেন, চা-ও

খাওয়ালেন। নবীনবাবু আমাদের ভুলে যাননি। আমরা যেরকম ডানপিটে ছিলাম কেউ সহজে আমাদের ভুলতে পারবে না।

আমরা আমাদের স্কুলের সামনে এসে পড়লাম। আমাদের গ্রামের অনেক উন্নতি হয়েছে দেখতে পেলাম, কিন্তু স্কুলটার কোন উন্নতি হয়েছে বলে মনে হল না। সেই ভাঙা দেয়ালটা এখনো সেই ভাঙা অবস্থাতেই আছে।

মংশুকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের হেডমাস্টার ভবতারণবাবু আছেন তো ?

মংশু বললে, আছেন, তবে শীগগিরই রিটায়ার করবেন।

আমরা পেয়ারা বাগানের পাশ দিয়ে চললাম। বাগানটা এখনো সেই আগের মতই আছে তবে রায়বাবুর বাড়ীটার কিছু উন্নতি হয়েছে বলে মনে হল। রায়বাবুও স্নুদের টাকায় বেশ মোটা হয়েছেন।

আমরা বাজারে আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে এল। এই বাজারটাই হল আমাদের গ্রামের প্রাণকেন্দ্র। বাজারটাও বেশ বড় হয়ে উঠেছে। অনেক নতুন নতুন দোকান হয়েছে, অনেক টিনের ঘর এখন পাকা হয়ে গেছে। উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলোয় বাজারটা ঝলমল করছিল।

শিবুর বাবা তাঁর ডিসপেনসারীতেই ছিলেন। আমরা তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি হাসি মুখে আমাদের কুশল প্রশ্ন করলেন।

এখান থেকে আমরা চারজনে দুখানা রিক্সা নিলাম। মংশু আমাদের রাতেও খেয়ে যেতে বললে। আমরা রাজী হলাম না।

আমি বললাম, কোন কাজের কথা তো আজ হল না। কিন্তু

তোর সঙ্গে আমাদের অনেক কিছু আলোচনা করবার বিষয় রয়েছে।

মংশু বললে, তোদের সঙ্গে আমারও অনেক কথা আছে।

স্থির হল কাল বিকেলে মংশুদের বৈঠকখানায় চায়ের সঙ্গে টা দিয়ে সবিস্তারে সবকিছু আলোচনা হবে।

মহা-বিপ্লবের প্রস্তুতি

আমরা সকলে এক এক করে মংশুর বৈঠকখানা ঘরে ঠিক বিকেলের চায়ের সময় ঢুকলাম। চায়ের সরঞ্জাম টেবিলের ওপর সাজানো ছিল। আর ছিল কয়েক থালা গরম সিঙ্গাড়া আর খাস্তা কচুরি। আমরা আপনাহাত জগন্নাথ করে পছন্দমত জিনিস নিয়ে বসলাম।

একটা সিঙ্গাড়া তুলে নিয়ে আমি বললাম, আমি আগেই বলে রাখি কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাস নিয়ে আজ আর একটা কথাও হবে না।

দেবু বললে, আমিও এই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম।

শিবু বললে, আজ শুধু মংশুকে নিয়ে আলোচনা হবে। এবং এই আলোচনা আজকেই শেষ করতে হবে কারণ কালকেই আমাকে চলে যেতে হবে।

দেবু মংশুকে বললে, তোর কথাই আগে শুনি। তোর মতলব-খানা কি। এখন কি ভাবছিস। কি করবি ঠিক করেছিস। বুঝেসুঝে একটা প্রোগ্রাম করতে হবে তো।

মংশু কিছু বলবার আগে আমি মংশুকে বললাম, তুই তো একটা

পরীক্ষা পাশ করলি, আর গোটা দুই বেড়া ডিঙ্গোতে পারলেই তুই আমাদের ধরে ফেলবি আর আমরাও তোকে টেনে তুলব। তাই বলছিলাম তুই কলকাতায় চলে আয় আমার সঙ্গে থাকবি, কোন অসুবিধা হবে না। সব ব্যবস্থা আমরা করে দেব।

শিবু ও দেবু এক সঙ্গে বলে উঠল, এটা একটা অতিশয় উত্তম প্রস্তাব। মংশুর আপত্তি করা উচিত নয়।

আমাদের কথা শুনে মংশু হেসে বললে, খুব উত্তম প্রস্তাবই বটে! তোরা চাস আমিও তোদের মত কেরাণী হয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দি। তোদের এই শুভেচ্ছার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

শিবু মহা আপত্তি করে বললে, আমি কেরাণী নই, আমি একজন ডাক্তার।

দেবু বললে, তুই একটা টেকনিকাল লাইন নিতে পারিস। তোকে আমরা মহা-বিজ্ঞানী করে তুলব।

মংশু বললে, এসব একই কথা, উনিশ আর বিশ। আমি কিন্তু একটা অন্যরকম চিন্তা করছি। আর সেই কথাটাই তোদের বলব ভাবছি।

আমরা এক সঙ্গে বলে উঠলাম, হ্যাঁ, নিশ্চয় বলবি। ভাল করে খুলে বল, আমরাও একটু চিন্তা করি।

খুব অল্প কথায় মংশু তার মনের কথাটা বলে ফেলল। বললে, আমি ভাবছি এখানে একটা পাঠশালা খুলে দেব।

ওর কথা শুনে আমরা অবাক হয়ে গেলাম।

শিবু বললে, আর তুই তার গুরুমশায় হয়ে বসবি।

মংশু বললে, বাংলা কথাটা পছন্দ হল না বুঝি? তাহলে

ইংরাজীতেই বলি। আমি এখানে একটা অতি আধুনিক হাইস্কুল খুলব। স্কুলটা একটু নতুন ধরনের হবে।

শিবু জিজ্ঞেস করল, তোর এই নতুন ধরনের আধুনিক স্কুলটা কোথায় হবে ?

মংশু বললে, কেন, এখানেই, এই আমাদের বাড়ীতেই।

দেবু বললে, এরকম একটা ব্রিলিয়েন্ট আইডিয়া তোর মাথায় কে ঢোকাল বলতো ?

আমি বললাম, মংশুকে আইডিয়া দেবার দরকার হয় না। ও-ই অনেকের মাথায় অনেক আইডিয়া দিতে পারে।

শিবু বললে, এসব বাজে কথা এখন থাক। কাজের কথাটাই আগে হোক। তোরা একটু বুঝবার চেষ্টা কর। কি হিসেবে মংশু তোর স্কুলটা নতুন ধরনের হবে একটু বুঝিয়ে বলতো।

মংশু বললে, ঠিক প্রশ্নই করেছিস। আমিও তোদের সব কথা বলতে এবং বোঝাতে চাই। আমার স্কুলটা নতুন ধরনের হবে এক হিসেবে যে আমার স্কুলে কোন বাৎসরিক পরীক্ষা মানে ক্লাশ প্রমোশনের পরীক্ষা থাকবে না। বছর শেষ হলে সকলেই উঁচু ক্লাশে উঠে যাবে। তাছাড়া আরো অনেক নতুনত্ব থাকবে।

মংশুর মনে কোথায় কাঁটা বিঁধে আছে তা আমরা বুঝতে পারলাম। আরো বুঝতে পারলাম মংশু এখনো সব কথা খুলে বলেনি। তাই আমি বললাম, তোর সব কথা খুলে বল। আমরা ভাল করে শুনি। তারপর বিবেচনা করে দেখতে হবে তোকে নিয়ে কি করা যায়।

মংশু বললে, আমি তো বলবার জন্য তৈরী হয়েই আছি।

তোরাই তো আজেবাজে বকতে শুরু করেছিস।

আমি বললাম, এটা তোর অন্যায় অভিযোগ।

দেবু বললে, আমি চুপ করলাম, আর একটা কথাও বলব না। তোর সব কথা তুই বল।

শিবু বললে, আমি তো চুপ করেই আছি।

মংশু নিঃশব্দে কয়েক চুমুক চা খেয়ে নিল। তারপর গলা সাফ করে বলতে লাগল, তাহলে শোন, গোড়ার কথাটা আগে বলি। আমরা তো সকলেই এক সময় স্কুলে পড়েছি এবং স্কুল সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আমাদের আছে। আমাদের সে ধারণাটা কি ধরনের একটু ভেবে দেখ। আমরা স্কুলে যেতাম লেখাপড়া শিখতে। মাস্টার মশায়রা ক্লাশে আসতেন আমাদের শেখাতে। কিন্তু আমরা শিখছি কি শিখছি না সে সম্বন্ধে মাস্টার মশায়দের মনে কোন রকম চিন্তা বা আগ্রহ থাকতো না। আমরা কিছু বুঝতাম, কিছু বুঝতাম না। আর বুঝতাম না বলে কোন প্রশ্ন করলে ঠিক মত উত্তর দিতে পারতাম না। তাই আমাদের সব সময় একটা চেষ্টা থাকতো মাস্টার মশায়দের নজর যেন আমাদের ওপর না পড়ে। সেই জন্য পেছনের বেঞ্চগুলিকেই আমরা নিরাপদ জায়গা বলে মনে করতাম। আমি শুধু আমাদের কথা বলছি না, সব ক্লাশের সব ছেলেদের কথা বলছি।

মাঝে মাঝে আমরা ধরা পড়েও যেতাম এবং পড়া বলতে পারতাম না বলে শাস্তি পেতাম। আচ্ছা ভাবতো, আমি হয়ত একটা ইংরাজী কথার মানে বলতে পারলাম না, কিম্বা দুলাইন বাংলা কবিতা মুখস্থ বলতে পারলাম না, অমনি পিঠে পড়ল বেত। সঙ্গে সঙ্গে কি আমি

ইংরাজী কথাটার মানে জেনে যাব—না বাংলা কবিতাটা হড়হড় করে মনে এসে যাবে। মাস্টার মশায়দের ধারণা রীতিমত শাস্তি দিলেই আমরা বিদ্যা দিগগজ হয়ে যাব। মাস্টার মশায়রা মনে করেন আমরা সবাই গাধা এবং গাধা পিটিয়ে মানুষ করার মহান দায়িত্ব তাঁদের।

তারপর বছরের শেষে ক্লাশ প্রমোশনের পালা। তখন আবার শুরু হয় মাস্টার মশায়দের আর এক-রকম খেলা।

এটা অতিশয় দুঃখের কথা মাস্টার মশায়রা কোনদিন চিন্তাও করেন না—কেন কিছু ছেলে ঠিকমত পড়া বলতে পারে না, কেন কিছু ছেলে পিছিয়ে থাকে, কেন কিছু ছেলে পরীক্ষায় ফেল করে, কেন কিছু ছেলে কিছু শিখতে পারছে না। আর মাস্টার মশায়দেরই বা দোষ কি! তাঁরা এসেছেন চাকরী করতে। আমরা কিছু শিখি বা না শিখি তাতে তাদের কিচ্ছু আসে যায় না। মাস কাবার হলেই তাঁরা বেতন পাবেন। আর সময় মত না পেলেই হৈ-হট্টগোল শুরু করে দেবেন। এই হল আমাদের স্কুলের অবস্থা।

মংশু দম নেবার জন্য থামল এবং চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল।

আমি বললাম, স্কুলের যে ছবিটা তুই দিলি তা নৈরাশ্যজনক না হলেও একেবারে অবাস্তব নয়। তবে আমার মনে হয় সব স্কুলই এরকম নয়।

দেবু বললে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি আছে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু তার জন্য শুধু শিক্ষকদের দোষ দেওয়া যায় না। আসল গলদ হল আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়।

মংশু বললে, আমি কারো দোষ ধরছি না বা কারো সমালোচনা

করছি না। আমি আমার নিজের স্কুল-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কথাগুলি বললাম। আর এই অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন স্কুল খুলতে যাচ্ছি তখন বুঝতেই পারছিস আমার স্কুল অন্য সব স্কুলের মত হবে না।

দেবু বললে, তোর কথা বুঝলাম। তোর স্কুল সম্বন্ধে এবার একটু খুলে বল।

মংশু ঠাণ্ডা চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বললে, তাহলে বুঝতেই পারছিস আমার স্কুলটা অন্যরকম হবে। আমার স্কুলে শিক্ষকদের প্রথম কাজ হবে ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো। বেত দেখিয়ে যে তাদের ঠাণ্ডা করবে তা চলবে না। কোন রকম শাস্তির ব্যবস্থা স্কুলে থাকবে না। আর স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম হবে খেলা আর গল্প। পাঠ্য বইতে আমরা যেসব কথা পড়ি তা সবই গল্প করে ছেলেদের শোনানো যেতে পারে। আর বই পড়াবার ওপর আমরা জোর যদি না দেই তাহলে ছেলেরা নিজের থেকেই আগ্রহ করে বই পড়তে শুরু করবে সব গল্প মিলিয়ে নেবার জন্য। সুতরাং স্কুলটা গল্পদাদুর আসর হয়ে উঠবে।

ছেলেরা ভয় পেতে পারে এরকম কোন জিনিস স্কুলে থাকবে না। তাই পরীক্ষা বলে কোন কিছু হবে না। বছরের শেষে সকলেই উঁচু ক্লাশে উঠে যাবে। কেউ প্রথম হবে না, কেউ লাস্টও হবে না। আপাতত নীচের ক্লাশে এই পদ্ধতিতে কাজ চলতে থাকবে।

শিবু বললে, তোর আইডিয়াটা মন্দ লাগছে না। উঁচু ক্লাশের জন্য তুই কি অন্য কোন ব্যবস্থার কথা ভাবছিস ?

মংশু বললে—না, সেরকম কিছু ভাবছি না। তবে প্রথম প্রথম

উঁচু ক্লাশ বলে তো কোন ক্লাশই থাকছে না। নীচের ক্লাশ নিয়ে স্কুল আরম্ভ হবে আর তারাই প্রমোশন পেয়ে উঁচু ক্লাশে উঠবে। উঁচু ক্লাশেও শিক্ষার মাধ্যম একই রকম থাকবে। তবে এখানে মাঝে মাঝে ছাত্ররাই পালা করে শিক্ষক হবে এবং শিক্ষক ছাত্রদের সঙ্গে মিশে থাকবেন, দেখবেন, শুনবেন। তবে অবস্থা বুঝে কিছু কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে। তবে আসল কথা ক্লাশ প্রমোশনের জন্য কোন রকম পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না।

দেবু বললে, তোর আইডিয়াটার ভেতর বেশ কিছু নতুনত্ব আছে স্বীকার করতেই হবে। তবে একেবারে কোন রকম পরীক্ষা থাকবে না কথাটা শুনতে কিরকম যেন লাগছে।

মংশু একটু বিস্ময় প্রকাশ করে বললে, একেবারে কোন রকম পরীক্ষা হবে না বলেছিলাম নাকি! তাহলে তো একটু ভুল বলা হয়েছে। তুই ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে পরীক্ষা হবে, তবে ক্লাশ প্রমোশনের জন্য নয়। পরীক্ষা হবে দেখবার জন্য ছেলেরা কিরকম করছে। ওদের বুদ্ধির বিকাশ কিরকম হচ্ছে তা বুঝবার জন্য। কে একটু পিছিয়ে আছে, কেন পিছিয়ে আছে, কাদের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া দরকার তা তাহলে জানা যাবে এবং সেই মত ব্যবস্থাও নেয়া যাবে। ছেলেদের স্কুলে পাঠিয়ে মা-বাবারা নিশ্চিন্ত থাকেন। সুতরাং ছেলেদের মানুষ করার পুরো দায়িত্ব তো আমাদের নিতেই হবে।

তাছাড়া মাঝে মাঝে আর এক ধরনের পরীক্ষাও হবে। এটা হবে ছেলেদের মানসিকতা, নিপুণতা, প্রবণতা, আই কিউ, এইসব তথ্য জানবার জন্য। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা নেবার জন্য।

শিবু বললে, এটা একটা কাজের কাজ হবে। তবে আমার মনে হয় ছেলেদের স্কুল না করে তুই যদি একটা মেয়েদের স্কুল করিস তাহলে খুব ভাল হয়। আমাদের গ্রামে একটা মেয়েদের স্কুলের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মংশু বললে, আমিও একথা ভেবেছিলাম। তারপর ভেবে দেখলাম তাহলে দুটো স্কুলই খুলতে হয়। তাই ঠিক করলাম একটা স্কুলেই ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও পড়বে।

দেবু বললে, কিন্তু তোর এই স্কুল চালাবার জন্য বিশেষ অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানী শিক্ষকের প্রয়োজন। এত জ্ঞানী লোক তুই কোথায় পাবি ?

মংশু বললে, আমার মনে হয় এটা কোন সমস্যা হবে না। আমরা আমাদের প্রয়োজন মত শিক্ষক তৈরী করে নেব। আমাদের হেড মাস্টার ভবতারণবাবু আমাদের সঙ্গে আছেন। রিটায়ার করে তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরিচালক হবেন। তিনি যেরকম উৎসাহ দেখাচ্ছেন তাতে মনে হয় বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না। তাছাড়া তোরা তো আছিস।

দেবু বললে, আরে আমরা তো তোর পেছনে সব সময়েই থাকব। যখন যা সাহায্য প্রয়োজন হবে সাধ্যমত মেটাতে চেষ্টা করব। এ বিষয়ে তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস।

মংশু বলে উঠল—না, না, আর্থিক কোন সাহায্য তোদের কাছে আমি চাই না। এর জন্য পিসি যে টাকা-পয়সা রেখে গেছেন তাই যথেষ্ট। আমি চাই তোদের। তোরা এখানে চলে আয়। আমরা

সবাই মিলে একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি।

মংশুর প্রস্তাব শুনে আমরা বিস্ময়ে চমকে উঠলাম।

আমি একটু সন্দেহ প্রকাশ করে বললাম, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে আমরা কি বিশেষ কিছু করতে পারব?

মংশু বললে, তোদের বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা যা আছে তা-ই যথেষ্ট। আসলে শিক্ষাগত যোগ্যতার চাইতে যেটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হলো একটা মানসিক প্রস্তুতি, একটা মহৎ উদ্দেশ্য, একটা অদম্য ইচ্ছা। ইউনিভারসিটির ডিগ্রীর চাইতে এগুলো বেশী দরকার। আর সবচেয়ে বড় কথা হল তোরা আমার ছেলেবেলার বন্ধু এবং তোদের ওপর আমি নির্ভর করতে পারি। আমার একটা নিজস্ব ধারণা বা থিওরী আছে। সে কথা তাহলে শোন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মংশু আবার বলতে লাগল, প্রত্যেক শিশুর ভেতরেই একটা বিরাট সম্ভাবনা ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু তাদের সকলের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠতে পারছে না উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে। আমাদের সেই উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। তা গড়তে হবে মায়ের মত স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে, বন্ধুর মত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে, সেবকের মত সদা সজাগ দৃষ্টি রেখে, আর এক মহৎ আদর্শে অবিচল থেকে। তোদের তো আমি ছোটবেলা থেকে জানি, তোরা তা পারবি। তোদের সে শক্তি আছে। তাই বলছিলাম তোরা এখানে চলে আয়। আমরা সবাই মিলে একটা মহা-বিপ্লবের সূচনা করি, তাকে সফল করে তুলি।

মংশুর কথা শেষ হল। আমরা সহসা কোন কথা বলতে পারলাম না। কেমন একটা থমথমে ভাব জমে উঠল। হঠাৎ শিবু

উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমি তো গ্রামে ফিরে আসব বলে ঠিকই করে রেখেছি তবে আরো কিছু ডাক্তারী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা দরকার।

মংশু আনন্দে শিবুকে জড়িয়ে ধরল। বললে, এই তো চাই। একজন ডাক্তার এই প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রয়োজনে লাগবে।

মংশু তারপর আমাদের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

আমি কোন রকমে বললাম, মংশুর প্রস্তাবটা ভাল করে বিবেচনা করে দেখবার মত।

দেবুও কিছু বলবার চেষ্টা করল কিন্তু কোন কথা বলবার আগেই মংশু বললে, বুঝেছি। তোরা ভাবছিস তোদের ভবিষ্যতের কথা। আরামের চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে শেষে কি অথৈ জলে পড়বি! ভাবছিস গরীব হালেই হয়ত থাকতে হবে, কোনদিন হয়ত ভাল মত আহারই জুটবে না, শুধু অভাব আর অনটনে দিন কাটাতে হবে। কিন্তু শোন, আমি এখানে আছি। আমাকে যদি অভাব-অনটনে থাকতে না হয়, তোদেরও কাউকে কোন রকম অভাবে থাকতে হবে না। একথা আমি বেশ জোর গলায় বলতে পারি। আমাকে তোরা এটুকু বিশ্বাস করতে পারিস।

আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম—না, না, আমি সেরকম কিছু ভাবছি না। আমি শুধু গভীরভাবে বিবেচনা করছিলাম।

মংশু বললে, তোরা কি ভাবছিস তোরাই জানিস। সাধারণত চাকরী জীবনের উচ্চাশা তো এই—পদোন্নতি হবে, কেরানী থেকে সেক্রেটারী, ডিরেক্টর। মাইনে বাড়বে, টাকা হবে। বাড়ী হবে, গাড়ী হবে, বিয়েও হয়ত করবি। পার্টি, জলসা এসব মাঝে মাঝে হবে। সস্ত্রীক বেড়াতে যাবি কাশ্মীর না হয় কাটমাণ্ডু। এসব

সম্ভাবনা পরিত্যাগ করে এই গ্রামে চলে আসা সত্যি সম্ভব নয়। কিন্তু একটু বয়স বাড়লেই তোদের মনে নানারকম চিন্তা-ভাবনা এসে যাবে। দুশ্চিন্তায় ভাল করে হয়ত ঘুমুতে পারবি না। ছেলেটা মানুষ হল, না মস্তান হল, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে এবং আরো অনেক রকমের চিন্তা। তখন তোদের মাথার মগজের গোবরের পোকাগুলি কিলবিল করে উঠবে। তখন গণতকারের কাছে যাবি ভাগ্য গণনা করতে, জ্যোতিষীদের কাছে যাবি গ্রহশান্তির জন্য, গ্রহরত্ন ধারণ করবি, মন্দিরে যাবি, পূজা দিবি এবং বোকার মত আরো অনেক রকম বোকামী করবি। তারপর একদিন হয়ত মরেই যাবি। তোরা যদি কেউকেটা হতে পারিস তাহলে তোদের ফটো শুদ্ধু শোকসংবাদ খবরের কাগজে ছাপা হবে, তোদের জন্য শোক-সভাও হবে। তোদের আত্মীয়-স্বজন শোক করবে। তবে তাদের এক চোখে থাকবে জল আর এক চোখ চারদিকে নজর দেবে তোরা তাদের জন্য কোথায় কি রেখে গেছিস। এরই নাম হল জীবন। এখন সত্যি করে বলতো, এইভাবে বেঁচে থেকে তোরা কি লাভটা করবি?

তার চাইতে এখানে চলে আয়। এখানে তোরা পরম শান্তিতে থাকতে পারবি। শহরের জৌলুস হয়ত এখানে পাবি না, আবোল-তাবোল কেনা-কাটা করবার বিলাসিতাও এখানে পাবি না। তবে এখানে কোন কিছুর অভাব কোনদিন বোধ করবি না। আর এখানে পাবি অজস্র ছেলেমেয়ের অজস্র ভালবাসা। এক কথায় এখানে তোরা রাজার মত থাকবি।

আর ভাবিস না, তোদের আমি বিয়েও দিয়ে দেব। তোদের

জন্য বেছে বেছে পরমা সুন্দরী, গুণবতী, শিক্ষিতা মেয়ে নিয়ে আসব। কারণ, আমার স্কুলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীও প্রয়োজন হবে।

মংশুর শেষের কথাগুলো শুনে আমি হেসে ফেললাম এবং হাসতে হাসতেই বললাম, বেশ বলেছিস মংশু! আমরা তোকে মানুষ করবার সাধু সংকল্প নিয়ে এখানে এসেছিলাম। এখন দেখছি তুই-ই আমাদের মানুষ করতে চাস!

মংশুও হেসে বললে, ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেবার মত বিষয় এটা নয়। আমি এ বিষয়ে খুব সিরিয়াস। তবে তোদের ওপর আমি কোন জোর খাটাতে চাই না। জোর করে, খোশামোদ করে, উপদেশ দিয়ে বা প্রলোভন দেখিয়ে কাউকে বিপ্লবী করা যায় না। বিপ্লবী মন ভেতর থেকেই আসবে। তোরা মনটাকে বিপ্লবী করে তোল, দেখবি কোন কাজই অসম্ভব নয়। আমার প্রস্তাবটা রইল। ভাল করে বিবেচনা করে দেখবি। আমার দুয়ার তোদের জন্য সব সময় খোলা থাকবে।

ভবতারণবাবু এসে পড়লেন। আমরা উঠে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনিও হাসিমুখে আমাদের কুশল প্রশ্ন করলেন।

মংশুর সঙ্গে ভবতারণবাবুকে নিয়ে আমরা বাইরে এলাম। বাইরে তখন মিস্ত্রীদের কাজ চলছিল।

এক জায়গায় ব্যারাকের মত একটা লম্বা দালান উঠছে। মংশু বললে, এইটে হবে স্কুলের বাড়ী। তিনতলার ভিত গাঁথা হয়েছে, তবে আপাতত দোতলা হবে।

এই ব্যারাকের সামনেই একটা ছোট দোতলা বাড়ী উঠেছে।

মংশু বললে, এইটে হবে স্কুলের অফিস। অফিস ঘর ছাড়াও এখানে মাস্টারদের বিশ্রামের ঘর থাকবে, একটা লাইব্রেরী এবং পড়াশুনা করবার ঘরও থাকবে, আর স্কুলের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামও এখানে থাকবে।

মংশু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাল। মাস্টারদের থাকবার জন্য আর এক জায়গায় আধুনিক স্টাইলে কোয়ার্টার উঠছে দেখাল। খেলার জায়গা, বাগান এবং আরো অনেক ছোট বড় ঘর এদিক-ওদিক উঠবে বলে দেখিয়ে দিল। মোট কথা বিরাট একটা কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে দেখলাম।

মংশুদের জমির অভাব নেই। তাই বেশ প্ল্যান করে স্কুলের জন্য ঘর-বাড়ী তৈরি করা সহজ এবং সম্ভব হয়েছে।

আমরা চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বেশ ভাল লাগল। সন্ধ্যার দিকে বাড়ী ফিরবার পথে শিবু বাজারের দিকে তার বাবার ডিসপেনসারীতে চলে গেল। আমি আর দেবু হাঁটা পথ ধরলাম।

চলতে চলতে দেবু বললে, মনে হচ্ছে পিসির টাকাগুলো মংশু এইভাবেই উড়িয়ে দেবে।

আমি কোন মন্তব্য করতে পারলাম না।

এই তো জীবন

কলকাতা ফিরে এসেছি। রীতিমত অফিসে যাওয়া-আসা করছি। মংশুর কথাও ভাবছি।

একদিন দল বেঁধে রবীন্দ্রসদনে গেলাম একটা নাচ-গানে ভরা নাটক দেখতে। নাটকটা অতি অপূর্ব মর্মস্পর্শী ছিল। বাড়ী ফিরবার পথে সেই সুর কানে বাজছিল আর মনে হচ্ছিল আমি যেন হাওয়ায় ভেসে ভেসে চলেছি। এরি নাম তো জীবন !

আবার একদিন দল বেঁধে গেলাম কলামন্দিরে। সেদিন ছিল ডিসকো নাইট। আমাদের মনও নেচে উঠল। মংশুর ভাষায় এই তো জীবন !

শুনলাম আমাদের মাইনে বাড়বে, ভাতাও বাড়বে। মহানন্দে আমরা এ ওকে জড়িয়ে ধরলাম। মনে হল এই তো জীবন !

পিকনিক করবার জন্য লাক্সারী বাস ভাড়া করে দীঘা চললাম। সমস্ত দিন হৈ হৈ করে কাটানো গেল। নতুন জীবন, নতুন অভিজ্ঞতা। এরই নাম তো জীবন !

আজকাল জীনস্ একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ না হলে মান-সম্ভ্রম আর বজায় থাকে না। একটা নামকরা দর্জির দোকানে গেলাম একটা জীনস্ প্যাণ্টের অর্ডার দিতে। মনে হল একটা মহা কাজ করা হল। এই তো আনন্দ, এই তো জীবন !

বোনাস ! বোনাস ! বোনাস ! বোনাস ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের মন আনন্দে নেচে উঠল। এই তো জীবন !

আমার সব কাজে সব সময় মংশুর কথা মনে পড়ছে। মন বড় চঞ্চল, কিছু স্থির করতে পারছি না।

একদিন একটা স্থির সিদ্ধান্ত নিতেই হবে।

প্রমোশন দিতে হবে
আটকে রাখা চলবে না